সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

কথাশিল্প প্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৬১

প্রকাশক

অবনী রঞ্জন রায়

কথাশিল্প প্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক

সুধীরকুমার বসু

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪১ অনাথনাথ দেব লেন

কলিকাতা ৩৭

বিনোদিনী দাসীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

যদি বঙ্গ-রঙ্গালয় স্থায়ী হয়,
বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী
আগ্রহের সহিত অন্বেষিত
ও পঠিত হইবে।

—গিরিশচন্দ্র

—সূচীপত্র—

আটটি আর্ট প্লেট সম্বলিত

সম্পাদকের নিবেদন

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বের প্রতিভাশালিনী ও সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনীর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। একালে অনেকের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের মধ্যে বিনোদিনীর নাম আমাদের মনে পড়ে না। অবশ্য বিনোদিনী তাঁর জীবনকালের মধ্যেই জনমানসের কাছে বিস্মৃত হয়ে এসেছিলেন। বিশেষত অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্মৃতি চিরদিনই তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনের পরে কেউ স্মরণ রাখে না। তাই সেকালের এই অভিনেত্রীর কথা বিস্মরণে হয়তো বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

এদেশে পাব্‌লিক্ থিয়েটার গঠনে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিনোদিনী শুধু অন্যতমা ন'ন, সম্ভবত প্রধানা। তাঁর অসামান্য অভিনয়-প্রতিভা, অত্যাশ্চর্য ত্যাগস্বীকার ও চারিত্রিক মহত্ত্ব তৎকালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ও নাট্য আন্দোলনের শক্তিশালী প্রেরণা হয়েছিল। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিনোদিনীর অভিনয়ের বিপুল প্রশস্তি আছে। একালে আমাদের সে-অভিনয় দর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না-থাকায় তৎকালীন দর্শক-সমালোচকের মতামতের উপর নির্ভর করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। আর একটি কারণে বিনোদিনীকে আমাদের স্মরণ করার কারণ ঘটেছে। তিনি সুলেখিকা। তাঁর রচনাবলী পাঠে আমরা বুঝি তাঁর অন্তঃকরণে কি অসামান্য সৃজনীশক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। অন্তত আমরা যারা একালের নাট্যানুরাগী তারা একারণেই বিনোদিনীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারি।

বিনোদিনী যদি লেখনী ধারণ না-করতেন তা'হলে বাংলা রঙ্গালয়ের বহু শক্তিশালী অভিনেত্রীর মত তাঁর নামটিও কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হতো এবং তথ্যসন্ধানী গবেষকের অনুসন্ধান কদাচিৎ তাঁর সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য প্রদান করতো মাত্র। অভিনয়কে যাঁরা নিজ প্রতিভা স্ফুরণের একতম অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এ ট্রাজেডি অনিবার্য। এই ক্ষেত্রে খুব বড় প্রতিভাও সাময়িকের সীমা পার হয়ে দূর কালের মানুষের চিত্ত স্পর্শ করতে পারেন না। প্রবাদে ও জনশ্রুতিতে কিছুকাল, সমব্যবসায়ীর অনুকরণের মধ্য দিয়ে আরো কিছুকাল এবং সমসাময়িক নথীপত্রে একান্ত গুপ্তভাবে যৎসামান্য বজায় থাকেন। তারপরে শুধুই কিংবদন্তীর নায়ক; রাজা বা রানী। অভিনয়কারী যে কত বড়

নট সে কথা বিচার ও তুলনা পরবর্তীকালে নিতান্তই অসম্ভব। একমাত্র যদি অভিনেতা নিজ ভাবনা ও উপলব্ধিকে কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আধারে সঞ্চিত রাখতে পারেন তবে তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি নিরূপণের একটা প্রয়াস পাওয়া যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের অসংখ্য উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের উত্তরসাধকদের জন্ম কোন স্থায়ী আদর্শ রেখে যেতে পারেন নি—সঙ্গীত-শিল্পীর মত কোন নির্দিষ্ট ঘরানার প্রবর্তনও করতে পারেন নি। অথচ আমাদের রঙ্গালয় ও তার অভিনয়-ইতিহাস নিয়ে আমাদের রীতিমত গর্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের অকারণ দৈন্যবোধের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

বিনোদিনী কিঞ্চিৎ লেখনী-চর্চা করেছিলেন, সে জন্যে তিনি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্রী। এই অসামান্যা অভিনেত্রী সেকালে বঙ্গীয় নাট্য দর্শকদের যেভাবে দিনের পর দিন আপন অভিনয়-প্রতিভা প্রদর্শনে বিমুগ্ধ করেছিলেন, বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁর অভিনয় দর্শনে আমাদের দেশের ও বিদেশের বহু মনীষী, চিন্তানায়ক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং দেশের সাধারণ মানুষ যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন, তাতে বেশ বুঝতে পারি, তিনি অলৌকিক প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর অভিনয় বাংলাদেশের রসিক ও ভাবুক সমাজে প্রায় একটা আন্দোলন উপস্থিত করেছিল। সেকালের পত্র-পত্রিকায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি এত বড় অভিনয়শক্তির অধিকারিণী সেই অভিনেত্রীর জীবনী ও ভাবজগৎটি জানবার অদম্য কৌতূহল আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কোথায় কোন্ পরিবেশে তাঁর জন্ম, কেন তিনি রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট হলেন, তাঁর মধ্যে কতখানি প্রস্তুতি ছিল, কার কাছে এবং কেমন করে তিনি শিক্ষা লাভ করলেন, বিভিন্ন দুরূহ চরিত্রগুলি কেমন করেই-বা তিনি মঞ্চে পরিস্ফুট করতেন, তাঁর ভাবজীবনটি কি ভাবে এতখানি উন্নত হতে পারলো ইত্যাদি বিষয়ে জানবার যে-কোন উপায়কে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না এবং উদগ্র ব্যাকুলতায় তাঁর কথা জানতে আমরা উৎসুক। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বিনোদিনী নিজ জীবনের এই চমকপ্রদ কাহিনী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা'য় অন্তত কিছুটা লিখে গেছেন।

শুধু নিজ জীবনের কথাই নয়, বিনোদিনী কবিতা লিখেছেন অনেক এবং নাটক ও রঙ্গালয় সম্পর্কে কখনো পত্রাকারে, কখনো নিবন্ধাকারে আলোচনা

করেছেন। নিজ জীবনকথাকেও নানা সময়ে নানাভাবে লিখতে চেষ্টা করেছেন, তাতে কখনো তথ্যের সমাবেশে কখনো অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির রূপায়নে মনোযোগী হয়েছেন। তিনি অনেগুলি গান বেঁধে গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন। একটি কাব্যোপন্যাসের রচয়িত্রীরূপেও আমরা তাঁকে পাচ্ছি। বঙ্গ নাট্যমঞ্চে তিনি অভিনয় করেছিলেন মাত্র ১৪ বছর; তাঁর যেসব রচনার খবর আমরা আজ পর্যন্ত পেয়েছি তাতে দেখা যায়, লেখিকা হিসাবে তাঁর চর্চার কাল ৪০ বছর।

বিনোদিনীর জীবনকথার মধ্যে বাংলা দেশের রঙ্গালয়ের যে ইতিহাসটুকু আছে তা অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস বিনোদিনীর অভিনয় ও রচনার সাক্ষ্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ। বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে বিভিন্ন সময়ে বিনোদিনী নিয়মিত অভিনয় করেছেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ সেকালের প্রধান নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটকে তিনি অত্যাশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। এই কালের নাটক ও নাট্যশালার বহু তথ্য ও ইতিহাসের উপকরণ তাই তাঁর আত্মজীবনী থেকে পাওয়া সম্ভব। সেকালের অভিনয়ের ধারা কেমন ছিল, দর্শকরা কি ধরনের নাটক পছন্দ করতেন, গিরিশচন্দ্র কত বড় নাট্য-শিক্ষক ও অভিনেতা ছিলেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর কেমন অভিনয় করতেন, সেকালের অন্যান্য অভিনেতারা কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন :ইত্যাদি অনেক কথা এই রচনাটির সহায়তায় জানা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে এই সব ব্যক্তির পরিচয় প্রায় প্রত্যক্ষবৎ সত্য করে তুলেছেন বিনোদিনী। এই বইখানিকে সেকালের নাট্যসমাজের একটি নির্ভরযোগ্য ও জীবন্ত দলিল বলে উল্লেখ করতে পারি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'-এ কিছুটা, দুই-একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ-বক্তৃতার বক্তা যৎকিঞ্চিৎ, এবং কয়েক জন রম্যসাহিত্য ব্যবসায়ীর ইতঃস্তত গালগল্প জাতীয় বিবরণ ব্যতীত বিনোদিনীর নাম পর্যন্ত অন্য কোথাও বিশেষ উল্লিখিত হতে দেখিনা। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই মহিলার জীবন, অভিনয়-প্রতিভার বিবরণ ও বিভিন্ন রচনা থেকে বিস্তর তথ্য ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারতেন। এমন কি, বিনোদিনীর 'আমার কথা'কে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীরূপে এবং তাঁর কবিতাকে বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবিদের কাব্যের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে স্থান

দিতে পারতেন। তাতে বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পেত, সাহিত্যের ইতিহাস আরো কিঞ্চিৎ পূর্ণাঙ্গ হতো। বিনোদিনী বারবার নিজেকে হীন বারাঙ্গনা বলে উল্লেখ করেছেন বলেই কি তাঁকে এভাবে 'ভদ্রলোকের সাহিত্য' থেকে বর্জন করা হয়েছে? ইসাডোরা ডানকানের 'আমার জীবন' পাঠ করে আমাদের মুগ্ধতার সীমা থাকে না—অথচ আমাদের দেশে বিনোদিনী এমন অত্যাশ্চর্য একটি আত্মকথা লেখা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে আমাদের বিস্মৃতি ও উদাসীনতা বেদনাদায়ক। এতে আমাদেরই অপরিমেয় ক্ষতি

ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যই নয়, নিছক একটি জীবনের কাহিনী হিসাবেও এই বই আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। কেমন করে এক সহায়-সম্বলহীনা বালিকা আপন চেষ্টায় ও যত্নে সেকালের অগণ্য লোকের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হতে পেরেছিলেন, কত বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করেছিলেন, আপনার একনিষ্ঠ সাধনায় দুরূহ-সিদ্ধি কেমন করেই-বা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল এবং সর্বোপরি, কেমন করে তিনি সেকালের নাট্যজগতের মহারথীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় নিজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করেছিলেন ও একদিন খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে উঠেও নীরবে রঙ্গশালার পাদপ্রদীপের আড়ালে বিদায় নিয়েছিলেন— এ সব কথা চিন্তা ও অনুভব করলে বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। বিনোদিনীর এই আত্মজীবনী পড়লে মনে হয় কোন এক মহৎ উপন্যাস পাঠের এবং তারও অতিরিক্ত এক অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করছি। যে সরলতা ও আন্তরিকতা, গভীর দুঃখবরণের মধ্য থেকে যে নিখাদ জীবন-উপলব্ধি ও সত্যদর্শন এবং যে গাঢ় ভাবুকতা এই ক্ষুদ্র রচনাটির মধ্য থেকে ফুটে উঠতে দেখছি তা নিঃসন্দেহে বিনোদিনীর প্রতিভার আংশিক প্রতিফলন।

এই রচনাটি পড়লে পাঠক কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক তথ্য বা তৎকালীন রঙ্গজগতের নেপথ্যলোকের কী বিবরণ অথবা বিনোদিনীর অত্যাশ্চর্য জীবনের কাহিনী লাভ করবেন সে-আলোচনার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। পাঠকের উপরই সে-দায়িত্ব ন্যস্ত। এই বই যেকালে প্রকাশিত হয়েছিল সেকালে বিনোদিনীর কথা নাট্য-প্রেমিক ব্যক্তিদের একেবারে বিস্মরণ হয়নি— যদিও তিনি অভিনয়-জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবু তাঁর কাহিনী লোকের মনে এক অতি কৌতুহলজনক গ্রন্থরূপে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। হতে পারে, 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

আশীর্বাদ লাভ বিনোদিনী সম্পর্কে অনেকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। এমন কি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত পরমহংসদেবের সঙ্গে ছদ্মবেশে বিনোদিনীর সাক্ষাৎকার সেকালের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া, অভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করলেও বিনোদিনীর অভিনয়-ক্ষমতা একটা 'মিথ্'-এ পরিণত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিনোদিনীর 'আমার কথা' বইটি পর পর দুই বছরে দুটি সংস্করণ প্রচারিত হওয়ায় আমরা তাঁর অপ্রতিহত জনপ্রিয়তারই প্রমাণ পাই। এমন কি, এই বইয়ের এক যুগ পরে বিনোদিনী পুনরায় নিজ স্মৃতিকথা রচনা আরম্ভ করেছিলেন এমন একটি পত্রিকায় যা সেকালের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। সে পত্রিকার নাম 'রূপ ও রঙ্গ'। এতে বিনোদিনীর অনেকগুলি অভিনয়-চিত্রও ছাপা হয়েছিল। এতে পাঠক সমাজের দাবীপূরণের ও বিনোদিনীর জনপ্রিয়তার নিদর্শন নতুন করে পাই। এ ঘটনা বাংলা ১৩৩২ সাল পর্যন্ত আমরা কাগজে পত্রেই দেখতে পাচ্ছি। এর পরে প্রায় ৪০ বছর পার হতে চললো। ইতিমধ্যে নানা কথায় নানা আন্দোলনে বিনোদিনীর কথা লোকে ভুলে গেছে, এমন কি আমাদের রঙ্গালয় ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকরাও তাঁর নাম বিশেষ করেন না। এরই মধ্যে কোন এক সময়ে (১৩৪৭ সালের ২৯শে মাঘ মঙ্গলবার মাঘীপূর্ণিমার রাত্রিশেষে; ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ খ্রীঃ) বিনোদিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। যে-অভিনেত্রীর অভিনয়গুণে গিরিশচন্দ্রের বহুব্যাপ্ত নাট্যখ্যাতি কিয়দংশে নির্ভর করেছে এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদি পর্বের বহু নাট্যকার ও নাটকের কথা ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সেই মহিয়সী নারীর কাছে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলার প্রভূত ঋণ। কিন্তু তাঁর রচনা বা তাঁর অভিনয়-প্রতিভার উল্লেখ পর্যন্ত একালে কোথাও নজরে পড়ে না। অথচ গিরিশচন্দ্র বলেছেন: "একথা বলিতে সাহস করা যায়, যদি বঙ্গ রঙ্গালয় স্থায়ী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে।"

এই বই পুনরায় প্রকাশ করার এই হচ্ছে একমাত্র যুক্তি ও কৈফিয়ৎ।

বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর নিজের কথা থেকেই জানতে পারি, ৯।১০ বছর বয়সে (অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে) তিনি প্রথম রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন 'বেণী সংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। ২৪।২৫ বছর বয়সে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর খ্যাতি ও ক্ষমতার চরম

সিদ্ধির লগ্নে রঙ্গালয়ের সংস্রব চিরতরে ত্যাগ করেন। এই বিদায়ের কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোবাদ অথবা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন অভিপ্রায়— সে, কথা সঠিক জানার কোন উপায় নেই। অবশ্য নিজে বিনোদিনী এই অবসর গ্রহণের কথা যে ভাবে উল্লেখ করেছেন (এই সংস্করণের ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তাতে থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর নানা প্রকার মনোভঙ্গ, ষ্টার থিয়েটার গঠনে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতারণা ও ক্ষমতাগত বিসংবাদই প্রধান বলে বোধ হয়। কিন্তু মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করবেন, থিয়েটারের প্রতি বিনোদিনীর যে দায়িত্ববোধ ও আদর্শবাদ জন্মেছিল, তাকে বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখে এবং নিজে এতদিন সর্বপ্রকার আত্মোন্নতির পথ পরিত্যাগ করে রঙ্গভূমির সেবায় যেভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন তার মর্যাদা না-পেয়ে বিনোদিনী অভিমানভরে রঙ্গালয় ত্যাগ করেন। তাঁর মত শিল্পীর এ অভিমানকে সকলে মূল্য দিতে পারে নি। 'আমার কথা'র শেষাংশে বিনোদিনীর মধ্যে যে বৈরাগ্য, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা, পরলোকচিন্তা, আত্ম-বিশ্লেষণ ও অনুতাপের বিস্তার দেখি তাতে বিনোদিনীর মনোজগতের এক বিরাট পরিবর্তনের আভাষও আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এই বছরটিতেই বিনোদিনীর রঙ্গালয় ত্যাগ। এ দু'টি ঘটনার মধ্যেও কোন যোগসূত্র থাকা সম্ভব কিনা জানি না। 'চৈতন্যলীলা'-র দ্বিতীয় খণ্ডের অভিনয়-প্রস্তুতি থেকেই বিনোদিনীর মানসিক পরিবর্তন তীব্রতর আকার নিচ্ছিল। যতদূর মনে হয়, অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে বিলাসিনী কারফরমার লঘু রসাত্মক ভূমিকাই তাঁর শেষ অভিনয়।

বিনোদিনী মাত্র ১২ বছর অভিনয় করেছেন— প্রায় ৫০টির অধিক নাটকে ৬০টির অধিক ভূমিকায়। একই নাটকে অনেকগুলি ভূমিকাভিনয়ের বিস্ময়কর আদর্শও সৃষ্টি তিনি করেছেন—'মেঘনাদ বধ'-এর নাট্যরূপে। এ নাটকে তিনি চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া ও সীতা— এই সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কত বিচিত্র ধরনের চরিত্র তিনি অভিনয়ে মূর্ত করে তুলেছেন তার কিছুটা আমরা তাঁর আত্মকথায় জানতে পারি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ফাদার লাফোঁ, এডুউইন আর্নল্ড প্রমুখ স্বদেশের ও বিদেশের মনীষীবৃন্দ সে সমস্ত অভিনয় দর্শনে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। সাধারণ দর্শকদের তো কথাই নেই। সমসাময়িক কাগজপত্রের সমগ্র বিবরণ এখানো

উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে। বহু পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় না, বহু তথ্য আমাদের চিরন্তন আত্মবিস্মরণপ্রবণতায় কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই।

একটা কথা আমাদের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হচ্ছে, বঙ্গ রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর প্রসঙ্গ তাঁর জীবনকালের মধ্যেই নাট্যপত্রিকা ও নাট্যপুস্তকের সম্পাদক ও গ্রন্থকারেরা যেন কিছুটা অবহেলা করেছেন! রঙ্গালয় ও অভিনয়ের ইতিহাস রচনার স্থানে কদাচিৎ তাঁর নামটি-মাত্র উল্লিখিত হচ্ছে বটে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা হতে দেখছি না। এমন কি সেকালের অভিনেত্রীদের সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রেও যেন আলোচকরা সচেতন হয়ে তাঁর কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন, 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা বাংলা ১৩১৭ সালে 'অভিনেত্রীর আত্মকথা' নামে বিনোদিনীর আত্মজীবনী সামান্য একটু অংশ দুই সংখ্যায় ছেপেছিলেন— কিন্তু তারপর সে-লেখা শেষ হয় না, পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বিনোদিনীর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হতে দেখি না। একই ব্যাপার ঘটে 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় বাংলা ১৩৩১-৩২ সালে। ঐ পত্রিকায় 'আমার অভিনেত্রী জীবন' অসমাপ্ত রয়ে যায়— পরের সংখ্যা থেকে অপরেশচন্দ্র 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' লিখতে থাকেন— কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কোন কৈফিয়ৎ দেননি। এর পেছনে বিনোদিনীর নিজস্ব কোন সংকোচ কাজ করেছিল, অথবা সহসা তিনি মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন, না অসুস্থ হয়ে পড়েন— তা বোঝবার আজ কোন উপায় নেই। কিন্তু যখন দেখি অপরেশচন্দ্র তাঁর ঐ বইতে বিনোদিনীকে সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে উল্লেখ করেই নিজ দায়িত্ব শেষ করেছেন, কিংবা 'অভিনেতৃ কাহিনী' নামে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সেকালের অভিনয়-শিল্পীদের এক জীবনী-গ্রন্থে বিনোদিনীর একটি ছবি মাত্র ছাপতে দেখি, অন্যদের মত জীবনী লিখতে দেখি না— তখন এ-সন্দেহ প্রবলতর হয় যে বিনোদিনীর কথা উপেক্ষা করবার একটা মনোভাব যে-কারণেই হোক, হয়তো নাট্যসমাজের মহারথীদের মধ্যে সেকালে দেখা দিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, ধর্মদাস সুর, তিনকড়ি, সুশীলাবালা, দানীবাবু, নরীসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বনবিহারিণী, রানীসুন্দরী, হরিসুন্দরী ইত্যাদির কথা আছে, অথচ বিনোদিনীর গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্য দিতে দেখা যাচ্ছে না। অমরেন্দ্রনাথের বইতে বিনোদিনীর একটি ছবি ছেপে নিচে লেখা হয়েছে: "বিনোদিনী 'ষ্টার' থিয়েটারে অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন। এক সময় ইঁহার

অভিনয়-নৈপুণ্যে নাট্যজগতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিয়াছিল। বিনোদিনী এক্ষণে রঙ্গালয়ের সংস্রবশূন্য।" অমরেন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির কাছে এর অনেক বেশী আমাদের প্রত্যাশা ছিল। একমাত্র উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী' বইতে বিনোদিনীর কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান পেতে দেখি। কিন্তু সেখানেও বিনোদিনীর 'আমার কথা' বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি ও সারাংশ বর্ণনা। নতুন কোন কথা ও মূল্যায়নের প্রয়াস সেখানেও অনুপস্থিত। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের যে-যে নাটকে অভিনয় করেছেন তার চরিত্রলিপির মধ্যে স্থান পেয়েছেন। পৃথক কোন পরিচয় নেই। 'বিশ্বকোষ'-এর রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) অধ্যায়ে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁর কথা নেই। একমাত্র গিরিশচন্দ্র 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় 'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়' নামে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এবং বিনোদিনীর বহু অনুরোধে তাঁর 'আমার কথা' বইয়ের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। এই সংস্করণের প্রারম্ভে মুদ্রিত 'অধীনার নিবেদন' নামে বিনোদিনীর লেখা পড়ে জানতে পারি সে-ভূমিকা বিনোদিনীর মনঃপূত হয়নি এবং গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সেটিকে তিনি গ্রহণও করেন নি। ইতিমধ্যেই গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ঐ ভূমিকা তখন তাঁর কাছে অন্য দিক থেকে মূল্যবান মনে হওয়ায় নব সংস্করণে ছেপেছিলেন। (সম্ভবত 'আমার কথা'-র দুটি সংস্করণ হয়নি। ভূমিকা ইত্যাদি অংশে কিছু পরিবর্তন করে এবং গিরিশচন্দ্রের ভূমিকাটি যোগ করে মূল মুদ্রণটিই 'নব' রূপে প্রচার করা হয়।) এসব থেকে এবং এই 'আমার কথা' পড়ার পর অন্যান্য অনুমানের অবকাশ মিলিয়ে মনে হয়— বিনোদিনীর সঠিক মূল্যায়ন সেকালে হয়ে ওঠেনি। এমনকি, নাটক ও নাট্যশালা নিয়ে সেকালে বাংলায় এতগুলি পত্রিকায় (নাট্যমন্দির, নাট্যপত্রিকা, নাট্যপ্রতিভা, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গালয়, নাট্যভারতী, রঙ্গ-দর্শন, রূপ ও রঙ্গ, নাচঘর, নটরাজ ইত্যাদি) আমরা বিনোদিনী সম্পর্কে নীরবতাই লক্ষ্য করেছি। একই ব্যাপার দেখেছি গিরিশচন্দ্র বিষয়ক বা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের ইতিহাসগত আলোচনা-গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে। গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে 'চৈতন্যলীলা' নিয়ে বিরাট উদ্দীপনার ইতিহাস আছে, অথচ যিনি চৈতন্য সেজে সেই নাটকের মূলভাবকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন সেই বিনোদিনীর উল্লেখ পর্যন্ত প্রায়ই দেখা যায় না।

বাংলার সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় যাঁদের উদ্যম প্রভূত পরিমাণে দায়ী তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস

স্বর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের নামের তালিকার পাশে বিনোদিনী দাসীর নাম পাওয়া যায় না।

একালের পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখের সুযোগ আগের চেয়ে কমেই এসেছে বলা যায়। অধিকন্তু সাম্প্রতিক কোন ছায়াছবিতে তাঁর সম্বন্ধে বিকৃত তথ্য পরিবেষণের নজীরও আছে। অথচ এইসব সেকালের পত্রিকায় বা গ্রন্থাদিতে বিনোদিনী সম্পর্কে আরো তথ্য বা মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা দেখতে পেলে আমাদের পক্ষে একালে একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সম্ভব হতো। দুটি পত্রিকায় আমরা কোন সন্ধানই পেলাম না— 'ভারতবাসী' ও 'সৌরভ'। অথচ পত্রিকাদ্বয়ে বিনোদিনীর অন্যান্য রচনা ছাপা হয়েছিল এ-কথার পরোক্ষ উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। সেগুলি পেলে বর্তমান সংস্করণে বিনোদিনীর রচনার পরিমাণ আরো বেড়ে যেতে পারতো এবং তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু জানা সম্ভব হতো।

'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে গিরিশচন্দ্রের একটি উক্তির (বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর রচনা-প্রকাশ উপলক্ষে) উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া গেছে। সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "অভিনেতা ও অভিনেত্রী আমার পুত্রকন্যাতুল্য। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাল লিখিতে পারেন। তাঁহাদের কোন গুণ অপ্রকাশিত থাকে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। এই নিমিত্ত ইহাদের রচনা আমি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে সভ্য-সমাজ যদি নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আমি গ্রাহ্য করিনা।"—এই উক্তির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের মহত্ত্ব ও দূরদৃষ্টির প্রমাণ যেমন পাই, তেমনি জানতে পারি বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর মধ্যে অভিনয়-প্রতিভা ব্যতীত রচনা-প্রতিভাও বর্তমান ছিল।

অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বিনোদিনী তাঁর আত্মকথা নিজে রচনা করেছেন, না কেউ (গিরিশচন্দ্র ?) তাঁর হয়ে লিখে দিয়েছেন! উপরে উদ্ধৃত গিরিশচন্দ্রের মন্তব্য তাঁদের সন্দেহ কিছু পরিমাণে নিরসন করবে বলে মনে হয়। এ ছাড়া, গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর আত্মকথাকে "তাহার স্বরচিত নাট্যজীবন" বলে উল্লেখ করেছেন (এই সংস্করণের ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। 'আমার কথা' যে বিনোদিনীর সম্পূর্ণ নিজের রচনা সে-বিষয়ে আর একটি প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের অনুরোধেই এই রচনায় হাত দেন। কিন্তু রচনাটিকে মার্জিত করে দেওয়ার অনুরোধ করায় গিরিশচন্দ্র জানিয়েছিলেন: "...তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া

দাও, আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব।" ('অধীনার নিবেদন' অংশটি দ্রষ্টব্য।)

কেমন করে বিনোদিনী এতখানি মার্জিত ও উন্নত মনের অধিকারিণী হলেন সে-কথা চিন্তা করে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন। নীচ কুলোদ্ভবা বলে তাঁকে মনে মনে হীন ভাবাই হয়তো তার কারণ। কিন্তু সম্ভবত হীনতা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামই তাঁর চিত্তের এতখানি উন্নয়ন সম্ভব করে তুলেছিল। তাছাড়া, তাঁর জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি বাল্যকালে বিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠাভ্যাস করেছিলেন এবং সকল কিছু জানা ও পড়ার জন্যে তাঁর মধ্যে অদম্য উৎসাহ ছিল। নিজের কন্যা শকুন্তলাকেও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্যে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি, যদিও তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট-ঙ; গিরিশচন্দ্র লিখিত ভূমিকা)। শিক্ষিত ব্যক্তি ও জ্ঞানী-গুণীদের সান্নিধ্য তিনি চিরদিন পছন্দ করতেন। দেশ-বিদেশের নানা সাহিত্য, কাহিনী, বিখ্যাত ব্যক্তিদের ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনী তিনি সাগ্রহে জানবার ও পড়বার চেষ্টা করতেন। গিরিশচন্দ্রের কাছে শিক্ষালাভের সময় তিনি বহু বিষয়ে জানবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, এ কথা তিনি আত্মকথায় একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। এ বই পড়ার পর পাঠকের সে বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ ঘটে না। মনে রাখতে হবে, বিনোদিনী ৪০ বছরব্যাপী নানা সময়ে নানা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন— সেগুলিও অন্য কেউ লিখে দিয়েছেন, একথা ভাবার কোন কারণ নেই। কবি-খ্যাতির জন্যে অভিনেত্রী বিনোদিনীর কোন লালসার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আত্মকথাও তিনি বার বার নতুন করে লিখেছেন। তাঁর ৪৭ বছর বয়স থেকে ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মোট তিনবার নিজের জীবনকথা লিখেছেন। প্রথবার লেখেন 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় অংশবিশেষ ও তা সম্পূর্ণ করেন না— সে সময় তিনি মোট ২৪ বছর থিয়েটারের সঙ্গে সংস্রবশূন্য। তারপর গ্রন্থাকারে 'আমার কথা' বেরোয়, তখন তাঁর বয়স ৪৯ বছর এবং ২৬ বছর থিয়েটারের সঙ্গে কোন সম্পর্কশূন্য। এই বইয়ের নব সংস্করণ বেরোয় পর বছরে। সর্বশেষ রচনা প্রায় ৬২ বছর বয়সে 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় নতুনভাবে একেবারে চলিত-গদ্যে নিজের স্মৃতিকথা। অবশ্য এটিও অসম্পূর্ণ। এর ৩৮ বছর আগে তিনি থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সক্রিয় যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন। সুতরাং প্রথম থেকেই বিনোদিনী যথেষ্ট পরিণত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও লেখনী নিয়ে নিজের

জীবনকথা রচনা আরম্ভ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার আগে 'ভারতবাসী'তে পত্রাবলী, 'সৌরভ'-এ অন্যান্য লেখা, দুখানি কবিতার বই বেরিয়ে গেছে তাঁর ৪২ বছর বয়সের মধ্যে।

বিনোদিনীর গদ্য রীতি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন আদর্শরূপে উল্লেখ করা যায়। মহিলা-লিখিত আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে আরো পাওয়া যায়; কিন্তু আন্তরিকতা, সরলতা, অভিজ্ঞতা, সহজবুদ্ধি এবং ভাবুকতার এমন সংমিশ্রণ আর কারও গদ্য রচনায় পাইনা। বিশেষত, বিনোদিনীর মত বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারিণীও অন্য কেউ ন'ন। 'আমার কথা'র ভাষা স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য। আপাতত সে চেষ্টা থেকে বিরত হওয়াই ভাল। 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রে পরে যে 'আমার অভিনেত্রী জীবন' বিনোদিনী লিখেছিলেন তার ভাষা চলিত গদ্য; কিছুটা যেন পুর্বতন সরলতার বদলে চেষ্টাকৃত মার্জিত ও শিষ্টরূপ অবলম্বনের প্রয়াস। তবু এ ভাষাও স্বলিত। এখানে ভাষা নিয়ে বিনোদিনীর সচেতন চিন্তার ছাপ আছে। কিন্তু 'আমার কথা' একেবারেই অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, হৃদয়-বেদনার অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা গদ্য লেখিকাদের মধ্যে কৃষ্ণকামিনী দাসী, কৈলাসবাসিনী দেবী, সৌদামিনী সিংহ, কামিনীসুন্দরী দেবী এবং রাসসুন্দরী দাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে একমাত্র রাসসুন্দরীর 'আমাব জীবন'-এর সঙ্গে বিনোদিনীর 'আমার কথা'র তুলনা সম্ভব। মহিলা কবিদের মধ্যে যে কারও সঙ্গে তুলনায় বিনোদিনীর কবিতা নিঃসন্দেহে সমপর্যায়ের। স্বাভাবিক বেদনাবোধ, ভাবুকতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিনোদিনীর কবিতাগুলিকে এক বিশিষ্ট মহিমা দিয়েছে। বাল্যকাল থেকেই একটি কবিমনের বিকাশ তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। 'আমার কথা'য় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আত্মকথার পাতায় পাতায় এই তাঁর কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি দেখতে পাই। বিনোদিনীর অনেক বিবরণই যে কবিতা তা গিরিশচন্দ্রও লক্ষ্য করেছেন (দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-১২৫)। এ কথাকে নিছক কল্পনা বলে ধরা চলে না। গদ্য রচনা ও কবিতার জন্যে বাংলা সাহিত্যে বিনোদিনীর স্থান যেখানে হওয়া উচিত— সেই যথার্থ ঐতিহাসিক স্থানটি আজ পর্যন্ত অপ্রতিষ্ঠিত রয়ে গেছে।

আর, বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয়-ইতিহাস কোনদিন রচিত হলে বিনোদিনীর স্থান হবে অভিনেত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে

'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য ('আমার অভিনেত্রী জীবন' উদ্ধার প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি) করা যেতে পারে।

…"গিরিশচন্দ্র বলতেন, বিনোদিনীর মত প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী সর্ব্বদেশেই বিরল।…ইনি বহু নাটক, গীতিনাটক ও প্রহসনে বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। ইহার পর অনেক শক্তিশালিনী অভিনেত্রী সেই সকল ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে বহুবার দেখা দিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে তাঁহার অভিনীত ভূমিকায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাও যে কেবল মহাকবি গিরিশচন্দ্র বা নাট্যাচার্য অমৃতলালের মুখে শুনিয়াছি তাহা নহে, প্রত্যক্ষ দর্শন বহু দর্শকের মুখেও এখনও সে কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার চৈতন্য, গোপা, দময়ন্তী, কপালকুণ্ডলা, মনোরমা, আয়েষা বা তিলোত্তমা— সবই অপূর্ব্ব, সবই অনন্যুকরণীয়।

"এ দেশে অভিনেত্রীদের যে সাজিবার ধরন চলিয়া আসিতেছে, তাহাও এই আদর্শ অভিনেত্রীর অনুকরণে। প্রসাধন বিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য এবং অধিকার ছিল। অভিনেত্রীদের মধ্যে সাজিবার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার, এমন কি, 'পিনটি' আঁটিবার ইতর বিশেষ, শুনিয়াছি তাহাও ইহার নিকট হইতে ধার করিয়া শেখা। যখন বিনোদিনী অভিনেত্রী জীবন লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, তখন, এদেশে অনুকরণ করিবার মত তাঁহাদের আদর্শ কেহ ছিল না। তিনি ও তাঁহারই উল্লেখযোগ্য দু একজন সঙ্গিনী নিজেদের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে সাজঘরের উন্নতি করিয়াছিলেন। বিলাতী থিয়েটারের বই এবং নানা দেশীয় চিত্রকলা হইতে বিনোদিনী প্রসাধন বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রচলন করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নহে!

"…নায়িকা বা উপনায়িকা সাজিবার উপযোগী অবয়ব, গঠন এবং কণ্ঠস্বরের সমাবেশ, একই পাত্রীতে এখন আর কোন রঙ্গমঞ্চেই দেখিতে পাওয়া যায় না এ কথা বলিলেও কিছু বাড়াইয়া বলা হয় না।…তবে আধুনিক দর্শক…তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমানই যথেষ্ট, কারণ তুলনা করিয়া অভাব অনুভব করিবার দুর্ভাগ্য হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।" (১১ শ সংখ্যা, ১৩৩১ সাল)

এর অধিক বলার প্রয়োজন দেখিনা। এতকাল পরে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে নতুন কিছু বলা যায়ও না।

স্বর্গীয় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে। তাঁর প্রতি আমাদের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

'এক্ষণ' দ্বিমাসিক সাহিত্য-পত্রিকায় বিনোদিনীর 'আমার কথা' বইটি তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় (২য় বর্ষ ; ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছে আমরা সর্ববিষয়ে ঋণ স্বীকার করি। বিশেষত সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন সিংহ মহাশয়ের কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের কাছেও আমরা ঋণী। শ্রী স্বদেশরঞ্জন দাস ও শ্রী অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তার জন্য আমরা বিশেষ উপকৃত।

সব দিক থেকে এই সংস্করণকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা গেল না। আরও তথ্য, চিত্র ও লেখা সন্নিবেশ করে বইখানিকে পূর্ণাঙ্গ করবার বাসনা আপাতত পূর্ণ হলো না। ভবিষ্যতে সর্ববিধ ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ রইলো।

বিনোদিনী দাসী আমাদের রঙ্গালয় ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদের জাতীয় গৌরব। তাঁর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। তাই বিনোদিনী সম্পর্কে যে-কোন নতুন তথ্য আমরা পাঠকবর্গের কাছে সাগ্রহে আহ্বান করি।

কলিকাতা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
নির্মাল্য আচার্য

ভূমিকা

আমার এই মর্ম্ম বেদনা-গাথার

আবার ভূমিকা কি ?

ইহা কেবল অভাগিনীর হৃদয়-জ্বালার ছায়া! পৃথিবীতে আমার কিছুই নাই, স্বধুই অনন্ত নিরাশা, স্বধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা! কিন্তু তাহা শুনিবারও লোক নাই! মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই—কেননা, 'আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিণী, পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার বলিতে এমন কেহই নাই।

তথাপি যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ক্ষুদ্র ও মহৎ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলকে সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনিই আবার আমাকে আমার কর্ম্মোচিত ফল লাভ করিবার জন্য আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা ও সান্ত্বনা অনুভব করিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা বলিবার বা যাতনায় অস্থির হইলে সহানুভূতি দ্বারা কিঞ্চিৎ শান্ত করিবার, এমন কাহাকেও দেন নাই। কেননা আমি সমাজপতিতা, ঘৃণিতা বারনারী! লোকে আমায় কেন দয়া করিবে? কাহার নিকটেই বা প্রাণের বেদনা জানাইব; তাই কালি কলমে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে মর্ম্মান্তিক ব্যথা বুঝাইবার ভাষা নাই। মর্ম্মে মর্ম্মে পিশিয়া প্রাণের মধ্যে যে যাতনাগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় তাহা বাহিরে ব্যক্ত করিবার পথ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু এই বিদ্যাবুদ্ধিহীনা, অজ্ঞানা, অধমা নারী যে কিছুই পারে নাই তাহা নিজেই মনে মনে বুঝিতেছি।

যাহা চক্ষে দেখিব বলিয়া কালি কলমে তুলিতে গিয়াছিলাম, হায়! তাহার তো কিছুই হইল না! স্বধুই এতগুলি কাগজ কালি নষ্ট করিলাম। বুঝিয়াছি যে মর্ম্ম-বেদনা স্বধু মনেই বুঝা যায়, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার কোন উপায় নাই, তাই বলিতেছিলাম যাহার কিছুই হইল না তাহার আবার পূর্ব্বোক্তি বা ভূমিকা কি ?

উপহার

আমার আশ্রয় স্বরূপ

প্রাণময় দেবতার চরণে এই ক্ষুদ্র

উপহার

প্রাণের কৃতজ্ঞতার সহিত অর্পিত হইল।

যে অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান অজ্ঞাত মহাপুরুষ ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বলিয়া বিরাজিত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে পুজিত হইতেছেন, তিনি চর্ম্মচক্ষের অতীত, বর্ণনা ও জ্ঞান বুদ্ধিরও অতীত! সেই অব্যক্ত অচিন্ত্য মহাপুরুষ তো চিরদিনই ধারণার অতীত রহিলেন! এ ক্ষুদ্র জীবনে কখন যে তাহার সীমা নির্দ্ধারিত করিতে পারিব, সে আশাও নাই।

কিন্তু সেই অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এই শোকসন্তপ্ত প্রাণ, এই ভগ্ন-হৃদয় যাহার চরণে আশ্রয় পাইয়াছে, যাঁহার অমৃতময় সান্ত্বনা-বারি দানে এ যন্ত্রণাময় পাপ প্রাণ এখনও এ দেহে রহিয়াছে; যাঁহার কৃপায় সেই আনন্দময়ী ননীর পুতলিকে পাইয়াছিলাম, এক্ষণে নিজ কর্ম্মফলে হারাইয়া এখনও জীবিত আছি!

সেই দয়াময় দেবতার চরণে, এই বেদনাজড়িত **"আমার কথা"** সমর্পণ করিলাম! একদিন যে অমূল্য ধনে দুঃখিনীর হৃদয় পূর্ণ ছিল; এক্ষণে আর তাহা নাই! অযত্নে অনাদরে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুধুই জীবনে মরণে জড়িত অশ্রুবারি মাখা জ্বলন্ত স্মৃতি আছে! হে দেবতা! এই তাপিত প্রাণের অশ্রুবারিই উপহার লইয়া এই অভাগিনীকে চরণে স্থান দিও, আমার আর কিছুই নাই, দেব!

এই পুস্তক লেখা শেষ করিয়া যাঁহার উদ্দেশে উপরোক্ত ভূমিকা লিখিত হয়; তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, যে আমার জীবনী লিখিয়া আপনাকে উপহার দিব, কেমন? তিনি তখন সহাস্য বদনে বলেন, যে "বেশ! তোমার যখন সকল ভার বোঝাগুলি বহিতেছি; তখন ও পাগলামির কালির আঁচড়গুলিও বহিব!"

যাঁহার উদ্দেশে উপরোক্ত উপহার প্রদত্ত হয়! সেই দয়াময় দেবতা এক্ষণে আর ইহ সংসারে নাই! (চিরদিন এ সংসারে কেহ থাকে না বটে) কিন্তু স্বর্গে

আছেন! স্বর্গ ও নরক, ইহজন্ম ও পরজন্ম, হিন্দু নরনারীগণ অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন বোধ হয়! এ বিশ্বাসের আরও একটী কারণ ও সান্ত্বনা আছে।

কেননা! স্নেহ ও ভালবাসা বলিয়া মানব-হৃদয়ে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জড়িত মধুময় মুখস্পর্শ ভাবলহরী হৃদিসরোবরে সতত উথলিত আবেগময় ভাবে খেলিয়া বেড়ায়; সেইটী বোধহয় মহামায়ার মোহিনী শক্তির বন্ধন স্বরূপ! মানব জীবনের প্রধান জীবনীশক্তি বলিয়া আমার মনে বিশ্বাস!

তাহাতেই ৵ বঙ্কিমবাবু মহাশয়ের নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিল যে "আমার সূর্য্যমুখী ঐ স্বর্গে আছে। আমার কাছে নাই, কিন্তু সে আমার স্বর্গে আছে!"

আবার সেই স্নেহময় ভালবাসারই আকর্ষণী শক্তিতে পিকৃমেলিয়নের গেলেটিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে সজীব মূর্ত্তি হইয়া পিকৃমেলিয়নের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন! আবার নিরাশার তাড়নায় পুনঃ প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন।

আমিও বলিতেছি যে তিনি পৃথিবীতে না থাকিলেও স্বর্গে আছেন! অবশ্যই সেইখান হইতেই সকলই দেখিতেছেন! এ হতভাগিনীরও হৃদয়-ব্যথা বুঝিতেছেন। অবশ্য যদি আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সত্য হয়, দেবদেবী সত্য হয়, জন্ম জন্মান্তর যদি সত্য হয়!

—: * :—

উপহারটা কি?

প্রীতির কুসুম দান!

সেই জন্যই আমার স্বর্গীয় প্রাণময় প্রীতির দেবতার চরণে **আমার কথা** উৎসর্গ করিলাম! তাঁহার জিনিস আবার তাঁহাকেই দিলাম! তিনি যেখানেই থাকুন আমার প্রাণের এই আকুলিত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার পবিত্র আত্মাতে স্পর্শ করিবেই! কেননা তিনি আমার নিকট সত্যে বদ্ধ, সত্যবাদীর সত্য কখনও ভঙ্গ হয় না! বিশেষতঃ যে প্রাতঃস্মরণীয় উন্নতবংশে তাঁহার জন্ম, সে বংশের বংশধর কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না! ইহা ত্রিজগতে বিখ্যাত।

অবস্থার বিপাকে এ সংসার হইতে যাইবার সময় তিনি কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া, যে তিনি তাঁহার সত্য প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যান নাই, তাঁহার কাতর দৃষ্টি ও প্রাণের ব্যাকুলতাই তাহার প্রমাণ! আমি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার চরণতলে উপস্থিত ছিলাম। কারণ, তিনি শত শতবার তাঁহার মস্তক স্পর্শ করাইয়া দিব্য করাইয়াছিলেন যে, আমি যেন তাঁহার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত থাকি। বোধহয় সেই সত্য রক্ষার জন্য ঈশ্বর আমায় দয়া করিয়া অযাচিতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত রাখিয়া, আমার সত্য রক্ষা করিলেন।

যে স্থান! আমার নিজের বলিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে যাইতাম, সেই স্থানে অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এই পাষাণ বক্ষে লোহার দ্বারা বন্ধন করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম। তিনি অতি কাতর ভাবে আমার মুখের দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন; বালিস হইতে মস্তক তুলিয়া এই পাপীয়সীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া যেন অতি কাতরে বলিতে লাগিলেন, আমি তোমার নিকট যে সত্য বদ্ধ হইয়া আছি, তাহা সকলে জানে, যাঁহারা আমায় জানে; তাঁহারা তোমায় জানে; যাঁহারা আমায় জানে, তাঁহারা সকলে তোমায় জানে।

আমার জীবনের অংশ বলিয়া যাহাকে জানি; যে ব্যক্তি আমার পদস্পর্শ করিয়া তোমার ভারগ্রহণ করিয়াছে, যাহাকে অতি শিশুকাল হইতে আজ ৩১ বৎসর পুত্র স্নেহে আদর করিয়া আসিতেছ; সে রহিল, ধর্ম্ম রহিল!

আমার দিকে চাহেন, আর পদ্মচক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া আইসে। তাঁহার সেই কাতর দৃষ্টি আমার বুকের ভিতর দিয়া প্রতি রক্তশিরায় আঘাত করিতে লাগিল।

অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন অমন

করিতেছ ? কি কষ্ট হইতেছে ? বল, একবার বল, তোমার কি যাতনা হইতেছে ?"
হায় ! কিছুই বলিলেন না ; সুধু কোলের উপর মাথা দিয়া কাতরে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ! আমি হতভাগিনী, শেষের একটী আশ্বাসবাক্য শুনিতেপাইলাম না।

যে প্রেমময় দেবতা আজ ৩১ বৎসর প্রায় শত সহস্রবার আমার নিকট ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া, দেবতা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন ; "যে যদি আমার কিছুমাত্র দেবতার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে ; যদি আমি পুণ্যময় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি তবে তোমাকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না। যখন এতদিন— প্রায় সমস্ত জীবন, মান, অপমান, সমান করিয়া আদরে স্থান দিয়াছি, তখন তোমার শেষ জীবনে বঞ্চিত হইবে না !" কিন্তু হায় মৃত্যু ! তোমার নিকট দুর্ব্বল বলবান, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক, জ্ঞানী অজ্ঞানী, কাহারও শক্তি নাই ; তোমারই শক্তি প্রবল। আহা ! হয়তো তাঁহার কত কথা বলিবার ছিল, কিছুই বলিতে পারিলেন না। কত বেদনাময় বুক লইয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া গেলেন।

জীবনে শতসহস্রবার বলিতেন, যে আমি তোমার আগে এ সংসার হইতে যাইবই তোমায় আগে যাইতে কখন দিব না। স্বচ্ছ তুমি আমার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকিও একটী কথা তোমায় বলিয়া যাইব। হায় ! হায় !! শেষ জীবনের মনের কথা, মনে রহিল ! সেই ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সহৃদয় দেবতা, চন্দ্রের ন্যায় একটী মাত্র কলঙ্ক রাখিয়া আমায় চির যাতনাময় সমুদ্রে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এই খণ্ডে "আমার কথা"র এই পর্য্যন্ত রহিল। কিন্তু যখন আমার যাতনাময় জীবনের শেষ নাই, তখন আমার কথারও শেষ নাই। আমার নাট্য-জীবনের পর ৩১ বৎসর যে দেবতার চরণে আশ্রয় লইয়া, জীবনের সার তৃতীয় অংশ যাঁহার সহিত, যাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সমভাবে কাটাইয়াছি ; যে পুণ্যময় দেবতা সত্যধর্ম্মে বদ্ধ হইয়া আমায় এত দিন আশ্রয় দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার জীবনের সেই সুখময় অংশ ও এই শেষের দুঃখময় অংশ শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল। হায় ভাগ্য ! যে দয়াময় আত্মীয় পরিবারের সহিত সমভাবে এক সংসারে স্থান দিয়াছিলেন ; যাঁহার অভাবে আজ আমি ভাগ্যহীনা জন্মদুঃখিনী— কোথায় সেই স্নেহপূর্ণ দেবহৃদয় ! হায় সংসার কি পরিবর্ত্তনশীল এখন মনে হইতেছে।

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশল্যা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদাদিত্যবধারয় ॥"

আমার নিবেদন

আমার শিক্ষাগুরু ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে এই আত্মকাহিনী লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখিতে দিই; তিনি দেখিয়া শুনিয়া যেখানে যেরূপ ভাবভঙ্গীতে গড়িতে হইবে উপদেশ দিয়া বলেন যে, তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া দাও। আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব। একটি ভূমিকা লিখিয়াও দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আমার মনের মতন হয় নাই।† লেখা অবশ্য খুব ভালই হইয়াছিল; আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না। আমি সেকথা বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়। সংসারে আমাদের ন্যায় রমণীগণের মান অভিমান করিবার স্থল অতি বিরল। এইজন্য যাঁহারা স্বভাবের উদারতা গুণে আমাদিগকে স্নেহের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের উপর আমরাও বিস্তর অত্যাচার করিয়া থাকি। একে রমণী অদূরদর্শিনী, তাহাতে সে সময় অভিমানে আমার হৃদয় পূর্ণ; গিরিশ বাবু মহাশয়ের রুগ্ন-শয্যা ভুলিয়া, তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া, সত্য ঘটনা সকল উল্লেখ করিয়া আর একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। তিনিও তাহা লিখিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার শিক্ষাগুরু ও সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যদি সকল ঘটনা ভূমিকায় উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে, আমার আত্মকাহিনী লেখা অসম্পূর্ণ হইবে। শীঘ্র ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলাম। স্নেহময় গুরুদেব আমায় বলিলেন,—তোমার ভূমিকা লিখিয়া না

*এই অংশটি দ্বিতীয় (নব) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। সম্পাদক।

† উল্লিখিত ভূমিকাটি 'পরিশিষ্ট : ঙ' রূপে গ্রন্থের শেষে ছাপা হলো। 'আমার কথা'-র প্রথম সংস্করণে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের এই ভূমিকাটিকে স্থান দেননি। পরের বছরে (১৩২০ সাল) প্রকাশিত 'আমার কথা'র নব সংস্করণে এটি মুদ্রিত করেন। সম্পাদক।

দিয়া আমি মরিব না। রঙ্গালয়ে আমি ৺গিরিশ বাবু মহাশয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলাম। তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী বলিয়া একসময়ে নাট্যজগতে আমার গৌরব ছিল। আমার অতি তুচ্ছ আবদার রাখিবার জন্ম তিনি ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! আমার মান অভিমান রাখিবার দুইজন ব্যক্তি ছিলেন, একজন বিদ্যায়, প্রতিভায়, উচ্চ সম্মানে পরিপূর্ণ, অন্যজন ধনে মানে যশে গৌরবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। এক্ষণে তাঁহারা কেহই আর এ সংসারে নাই। আমার তুচ্ছ আবদার রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গের গ্যারিক্ গিরিশবাবু আর ফিরিয়া আসিবেন না। 'ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া মরিব না' বলিয়া তিনি আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার পুনর্ব্বার-লিখিত ভূমিকা সম্পূর্ণ হইলে, আমার আত্মকাহিনীর নব সংস্করণ করিব। কিন্তু আমার শিক্ষাগুরু ভূমিকা লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমায় শিখাইয়া গেলেন যে, সংসারের সকল সাধ সম্পূর্ণ হইবার নয়।

সম্পূর্ণ ত হইবার নহে, তবে যাহা আছে, তাহা লোপ পায় কেন? আমি গিরিশ বাবু মহাশয়ের পূর্ব্বলিখিত ভূমিকাটি অন্বেষণ করিতে গিয়া শুনিলাম যে, গিরিশ বাবুর শেষ বয়সের নিত্যসঙ্গী পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। সেটি তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমার ক্ষুদ্র কাহিনীর সহিত গাঁথিয়া দিলাম। আমার শিক্ষাগুরু মাননীয় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে ও বিশেষ অনুরোধে লিপিবদ্ধ হইয়া আমার আত্মকাহিনী প্রকাশিত হইল। কিন্তু তিনি আজ কোথায়? হায়— সংসার! সত্যই তুমি কিছুই পূর্ণ কর না! এ ক্ষুদ্র কাহিনী যে স্বহস্তে তাঁহার চরণে উপহার দিব, সে সাধটুকুও পূর্ণ হইল না।

বিনীতা

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

বিনোদিনী দাসী

১৮৬৩-১৯৪১

বিনোদিনী

বিনোদিনী

বিনোদিনী

বিনোদিনী শরৎ-সরোজিনী নাটকে পুরুষ বেশে

বিনোদিনী — মতি বিবির রূপসজ্জায়

বিনোদিনী আয়েষার ভূমিকায়

বিনোদিনী

বাল্য-জীবন

অঙ্কুর

১ম পত্র।

১লা শ্রাবণ। ১৩১৬ সাল।

মহাশয়!

বহু দিবস গত হইল, সে বহুদিনের কথা, তখন মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞাতভাবে জীবন লুক্কায়িত ছিল না। সে সময় মহাশয়, বারবার কতবার আমাকে বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে এ সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য্য করে; আবার কার্য্য শেষ হইলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।" আপনার এই কথাগুলি আমি কতবার আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আমি তো আমার জীবন দিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে আমার ন্যায় হীন ব্যক্তির দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি তাঁর কি কার্য্য করিয়াছি, এবং কি কার্য্যই বা করিতেছি; আর যদি তাহাই হয় তবে এতদিন কার্য্য করিয়াও কি কার্য্যের অবসান হইল না? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? এরূপ হীন কার্য্য কি ঈশ্বরের?

বার বার আমার অশান্ত হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, "কৈ সংসারে আমার কার্য্য কৈ?" এই তো সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল! তবে এতদিন আমি কি করিলাম? কি সান্ত্বনা বুকে লইয়া এ সংসার হইতে বিদায় লইব! আমি কি সম্বল লইয়া মহাপথের পথিক হইব! মহাশয় অনেক বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমায় বুঝাইয়া দিন, যে ঈশ্বরের কোন্ কার্য্যেআমি ছিলাম ও আছি এবং থাকিব।

অনুগৃহিতা।

২য় পত্র।

৭ই শ্রাবণ।

মহাশয়!

মরুভূমে পতিত পথিকের তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ যেমন দূরে সুশীতল সরোবর দর্শনে তৃপ্তি পায়; সেইরূপ মহাশয়ের আশা-বাক্যে আমার প্রাণের কোণে

আবার আশার আলোক দেখা দিতেছে। কিন্তু যে ঈশ্বরের জগতপূর্ণ নাম, কোথায় সে ঈশ্বর? কোথায় সেই দয়াময়? যিনি আমার মত পাপী তাপীকে দয়া করেন? আপনি লিখিয়াছেন, "কি কার্য্যে সংসারে আছি, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই। যিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা তিনিই জানেন।" অবশ্যই জানেন! তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী তিনি তো জানিবেনই! কিন্তু আমার কি হইল? আমার যে জ্বালা সেই জ্বালাই আছে, যে শূন্যতা সেই শূন্যতাই! আমার কি হইল? আমার সান্ত্বনার জন্য কি রাখিলেন? শেষ অবলম্বন একটি মধুময়ী কন্যা দিয়াছিলেন আমি তো তাহা চাহি নাই, তিনিই দিয়াছিলেন তবে কেন কাড়িয়া লইলেন? শুনেছিলাম দেবতার দান ফুরায় না! তার কি এই প্রমাণ? না অভাগিনীর ভাগ্য? হায়! ভাগ্যই যদি এত বলবান, তবে তিনি পতিতপাবন নাম ধরিয়াছেন কেন? দুর্ভাগা না হইলে কেন আকিঞ্চন করিব, কেন এত কাঁদিব! যে জন ভক্তি ও সাধনের অধিকারী সে তো জোর করিয়া লয়! প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি আর আর ভক্তগণ তো জোর করিয়া লইয়াছেন। আমার মত অধম, যদি চিরযাতনার বোঝা বহিয়া অনন্ত নরকে গেল, তবে তাঁহার পতিতপাবন নাম কোথায় রহিল?

আপনি লিখিয়াছেন—"তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইয়াছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয় স্থলে তোমার অদ্ভুত শক্তি দ্বারা যেরূপ বহু নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার 'চৈতন্যলীলায়' চৈতন্য সাজিয়া বহুলোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যে সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে সে সকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। যদিচ তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার দোষে নয় অবস্থায় পড়িয়া, এবং তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।"

মহাশয় বলিতেছেন—দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছি। দর্শক কি আমার অন্তর দেখিতে পাইতেন! কৃষ্ণ নাম করিবার সুবিধা পাইয়া কার্য্যকালে, অন্তরে বাহিরে কত আকুল প্রাণে ডাকিয়াছিলাম! দর্শক কি তাহা দেখিয়াছেন? তবে কেন একমাত্র আশার প্রদীপ নিবিয়া যাইল? আর অনুতাপ! সমস্ত জীবনই তো অনুতাপে গেল। পদে পদে তো অনুতপ্ত

হইয়াছি, জীবন যদি সংশোধন করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে অনুতাপের ফল হইত বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু অনুতাপের কি ফল ফলিয়াছে? এখনও তো স্রোতে মগ্ন তৃণ প্রায় ভাসিয়া যাইতেছি। তবে আপনি কাহাকে অনুতাপ বলেন জানি না। এই যে হৃদয় জোড়া যাতনার বোঝা লইয়া তাঁর বিশ্বব্যাপী দরজায় পড়িয়া আছি কেন দয়া পাই না; আর ডাকিব না, আর কাঁদিব না বলেও যে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" করিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণ হইতে যাহাকে ডাকিতেছি, কোথায় সে হরি?

বাল্যকাল হইতে কত সাধ, কত বাসনা, কত সরল সৎপ্রবৃত্তি কালের কোলে ডুবিয়া গিযাছে, কেমন করিযা বলিব? কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া, জগৎ-সুন্দর জগদীশ্বরের দিকে যে বাসনা সৎপথে ছুটিতে চাহিত, তখনি মোহজালে জড়িত মন তাহাকে চোরাবালির মোহে ডুবাইয়া দিয়াছে। যখন জোর করিয়া উঠিতে আগ্রহ হইত, কিন্তু চোরাবালিতে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়া, জোর করিয়া উঠিতে গেলে যেমন বালির বোঝা সব চারিদিক হইতে আরও উপরে আসিযা পড়িয়া তাহাকে পাতালে ডুবাইয়া দেয়, আমার দুর্ব্বল বাসনাকেও তেমনি মোহ-ঘোর আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। বলহীন বাসনা আশ্রয় পায় নাই, ডুবিয়া গিয়াছে। চোরাবালিতে পড়িয়া পুতে যাওয়ার ন্যায ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ডুবিয়াছে! কিন্তু এখন তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি যে বাসনা প্রবৃত্তি উপরে ছুটিতে চায়। কে যেন ঘাড় ধরিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহা তো বুঝিতে পারি না। তখন কত কাতরে কাঁদি, তবু ডুবি! শক্তিহীন দুর্ব্বল বলিয়াই ডুবি। বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়! মহাশয় মনের আবেগে কত কথা আসিয়া পড়িতেছে। যাহার দিকে চাহিয়া, যাহাকে বড় আপনার করিয়া বড়ই অনাথ হইয়া চরণ ধরিয়া আপনার করিতে যাই, তবু দূরে বহুদূরে পড়িয়া থাকি! অধিক বলিয়া বিরক্ত করিব না, এক্ষণে বিদায় হই!

অভাগিনী।

৩য় পত্র।

মহাশয়!

পূর্ব্বের অবস্থা যাহাই থাকুক, উপস্থিত অবস্থায় কি কার্য্যে আছি! রুগ্ন, অথর্ব্ব, ভবিষ্যৎ আশা শূন্য, দিনযামিনী এক ভাবেই যাইতেছে, কোনরূপ উৎসাহ নাই। রোগ-শোকের তীব্র কশাঘাত, নিরুৎসাহের জড়তায় আচ্ছন্ন

হইয়া অপরিবর্ত্তিত স্রোত চলিতেছে। আহার, নিদ্রা ও দুশ্চিন্তা, প্রতিদিনের ছবি একদিনে পাওয়া যায়, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ কোনই পরিবর্ত্তন নাই। কেবল মাত্র প্রভেদ এই কখন কখন রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি সদা সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তি! কেহ যত্ন করিয়া উপশমের চেষ্টা করিলে, সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইতে বলিলে মনে মনে হাসি পায়! কারণ তাঁহারা এই বলিয়া আশ্বাস দেন, বলেন "সুস্থ হইয়া থাক কোনরূপ চিন্তা করিও না।" আমি ভাবি তাঁহারা আমার অবস্থা বোঝেন না। তাঁহারা বোঝেন না যে যদি চেষ্টা করিয়া সুস্থ থাকা সম্ভব হইত; সে চেষ্টা শত সহস্ররূপে হইযাছে, এবং তাঁহাদের বলার অপেক্ষা থাকিত না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা আমার মতন ভাগ্যহীনা লোকের স্বরূপ অবস্থা না বোঝেন। কারণ এরূপ অবস্থায না ঠেকিযা কেহ বুঝিতে পারে না। সতত্ই মনে হয যে এই আশাশূন্য দুশ্চিন্তায় সদা সর্ব্বদা মগ্ন থাকাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? সর্ব্বদাই বলি ভগবান আর কতকাল। দুঃখের অবসান না হউক অন্ততঃ স্মৃতির জলন্ত যাতনা হইতে নিস্তার পাইয়া শান্তি লাভ করি। সে যন্ত্রণা অতি তীব্র। বিনীত ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এইরূপ জরাজীর্ণ দেহ লইয়া অবসন্ন ভাবে সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া কি আপনার মতে ঈশ্বরের কার্য্য হইতেছে?

৪র্থ পত্র।

মহাশয়!

আপনাকে যখন দুঃখের কথা জানাইয়া পত্র লিখি, পত্রের উত্তরে আপনার সান্ত্বনা বাক্যে আশার ক্ষীণ আলোক হৃদয়ে দেখা দেয়! কিন্তু সে ক্ষণিক—মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়। আপনি তো জানেন আমার তমোময় হৃদয়ের আলোক স্বরূপ একটী কন্যা অযাচিত রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে কন্যাটী নাই। এক্ষণে আমার গাঢ়তমাচ্ছন্ন হৃদয গাঢ়তর তিমিরে ডুবিয়াছে। যত প্রকারে সান্ত্বনা আনিবার চেষ্টা পাই সকলই বিফল। "ঈশ্বর দয়া কর" "হরি দযা কর"—বারবার বলি সত্য, কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখিতে পাই যে আমার সেই প্রাণপ্রতিমার জন্য আমি লালায়িত। যেমন দিক নির্ণয় যন্ত্রের সূচিকা উত্তরাভিমুখে থাকে, আমারও মন সেইরূপ সেই হারানিধিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। যিনি মাতার বেদনা জানেন না, তিনি আমার বেদনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কন্যার জন্ম হইতে

মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনা আমার মানস দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। এ অবস্থায় শান্তি কোথায়? সততই মনে হয়, আমি কি এই দারুণ যন্ত্রণা ভোগের জন্য সৃষ্টি হইয়াছি! আপনার নীতিগর্ভ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে হয়তো বা শান্তিলাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস আমার কোথায়? বাল্যকাল হইতে সংসারচক্রে পড়িয়া অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, এই অবিশ্বাসের জন্য আমার অভিভাবক, সাংসারিক অবস্থা ও আমি নিজে দায়ী! কিন্তু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ফল কি? অবিশ্বাস অবিশ্বাসই আছে। অবস্থায় পড়িয়া যে দিকে মনের গতি, তাহার বিপরীত দিকে চিরদিনই চালিত হইয়াছে। এই বিপরীত যুদ্ধে শরীর-মন জর্জ্জরীভূত। বলিয়াছি আমার হৃদয় সেই স্নেহ-প্রতিমার দিকে দিবারাত্র রহিয়াছে। তাহার আলোচনা দুঃখময়, কিন্তু সেই আলোচনাই আমার সুখ! হতাশ্বাসপূর্ণ সন্তান-হারা হৃদয়ে আর অপর সুখ নাই। অবিশ্বাসের মূল কিরূপ দৃঢ় হইয়া অন্তরে বসিয়াছে, তাহা আমার জীবনের ঘটনাবলি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। আপনি বলেন, আমার আজীবন বৃত্তান্ত শুনিলে, আমি যে ঈশ্বরের কার্য্যে সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। আমিও আমার আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি বিবৃত করিব। যদি কৃপা করিয়া শুনেন, বুঝিতে পারিবেন অবিশ্বাস কিরূপে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এবং তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব! শান্তির মূল বিশ্বাস, হয়ত বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই বিশ্বাস কোথায়? আমার প্রতি আপনার অশেষ স্নেহ, এই নিমিত্ত সাহস করিয়া আদ্যোপান্ত বলিতেছি। কৃপা করিয়া শুনুন! শুনিতে শুনিতে যদি বিরক্তি জন্মায় পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। শুনিবেন কি?

মহাশয় আপনি আমার ক্ষুদ্র জীবনী শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়। আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি দয়া করিয়া শুনিলে কৃতার্থ হইব এবং আপনার ন্যায় মহৎ লোকের নিকট হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া এ দুর্ব্বিসহ হৃদয়ভার কতকটা লাঘব করিব।

১ম কথা (পল্লব) রঙ্গালয়ে প্রবেশের সূচনা

বাল্য-জীবন

আমার জন্ম এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে সহায় সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না, কেননা কষ্টে-শ্রেষ্টে এক রকম দিন গুজরান হইত। তবে বড় সুশৃঙ্খলা ছিলনা, অভাব যথেষ্টই ছিল। আমার

মাতামহীর একখানি নিজ বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘর অনেকগুলি ছিল। সেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ১৪৫ নম্বর বাটী এখন আমার অধিকারে আছে। সেই সকল খোলার ঘরে কতকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিয়া বাস করিত। সেই আয় উপলক্ষ করিয়াই আমাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত। আর তখন দ্রব্যাদিসকল সুলভ ছিল; আমরাও অল্প পরিবার। আমার মাতামহী, মাতা আর আমরা দুটী ভ্রাতা ভগ্নী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সহিত আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তখন আমার মাতামহী একটী মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল। কারণ ইহার অগ্রেই মাতামহীর ও মাতাঠাকুরানীর যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরানী বড়ই স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণকারের দোকানে এক একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া আমাদের হাতে দিতেন, অলঙ্কার বিক্রয় জন্য কখন দুঃখ করিতেন না।

আমার সেই সময়ের একটা কথা মনে পড়ে; আমার যখন বয়স বছর সাতেক তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম্ম-বাড়ী গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটী সন্দেশ চাহিয়া আনিয়াছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশ পনের দিন তুলিয়া রাখিয়া, মায়া কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন; এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত! আমার মাতা তাহা বাটীতে আনিয়া আমাদের তিনজনকে আনন্দের সহিত খাইতে দেন। পাছে সেই দুর্গন্ধ সংযুক্ত সন্দেশ শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এইজন্য অতি অল্প করিয়া খাইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা হইয়াছিল। এই আমার সুখের বাল্যকালের ছবি।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতি অল্প বয়সেই আমার মাতাকে চিরদুঃখিনী করিয়া এ নারকীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার মৃত্যুতে আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরানী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমার ভ্রাতা অসুস্থ হইলে অর্থের অভাবে তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে হয়। আমরা দুটি ক্ষুদ্র বালিকা বাটীতে থাকিতাম। আমাদের একটি

দয়াবতী প্রতিবেশিনীর জন্য আমাদের আহারাদির কোন কষ্ট হইত না। তিনি আমাদের সঙ্গে করিয়া আমার মাতার ও মাতামহীর আহার লইয়া ডাক্তারখানায় আমার ভ্রাতাকে দেখিতে যাইতেন। কোন কোন দিন তাঁহাদের আহার করিবার জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে আমার ভ্রাতার নিকট বসিয়া থাকিতেন। পরে আবার তাঁহারা আহার সমাপন করিয়া সেইখানে যাইলে আমাদের সঙ্গে করিয়া বাটী আসিতেন। কেবল আমাদের বলিয়া নহে, তিনি স্বভাবতই পরোপকারিণী ছিলেন। যদি রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় কেহ আসিয়া তাঁহাকে বিপদ জানাইত; তখন অমনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে তাহাদের বাটী যাইতেন। পরে নিজের শরীর দ্বারাই হউক আর পয়সার দ্বারাই হউক লোকের উপকার সাধন করিতেন। তাঁহার মতন পরোপকারিণী এখনকার দিনে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার নিজের কিছু সম্পত্তি ছিল, সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। পরোপকারই তাঁহার ব্রত ছিল।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়েই আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সে দিন আমার স্মৃতি-পটে জাজ্বল্যমান আছে। তখন ভাবিতে লাগিলাম আবার আমার ভাই আসিবে না কি? যমে নিলে যে আর ফিরাইয়া দেয় না, দৃঢ়রূপে তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আমার মাতামহী আমার ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন কিন্তু অতিশয় ধৈর্য্যশালিনীও ছিলেন। তাঁহার শুনা ছিল, ডাক্তারখানায় মরিলে মড়া কাটে, গতি করিতে দেয় না! যেমন আমার ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিল, তিনি অমনি সেই মৃতদেহ বুকে করিয়া তিনতলার উপর হইতে তড়্ তড়্ করিয়া নামিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে যেন ছুটিলেন। আমরা আমার মাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। আমার মাতাঠাকুরানী কেমন বিকৃত হৃদয় হইয়াছিলেন, তিনি হাঃ হাঃ করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতে লাগিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারখানার বড় ডাক্তার বলিতে লাগিলেন; "ব্যস্ত হইও না, আমরা ধরে রাখিব না!" কিন্তু দিদিমাতা শুনেন নাই, তিনি একেবারে কোলে করিয়া লইয়া গঙ্গার তীরে মৃতদেহ শয়ান করাইয়া দেন। গঙ্গার উপর সেই ডাক্তারখানা। তখন একজন ডাক্তার সেইখান পর্য্যন্ত দয়া করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে "এখনই সৎকার করিও না, অতিশয় বিষাক্ত ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, আমি আবার আসিতেছি।" পরে তাঁহারা ঘণ্টাখানেক সেই গঙ্গাতীরে সেই মৃতদেহ কোলে

লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ডাক্তার বাবু আসিয়া আবার অনুমতি দিলে তবে কাশী মিত্রের ঘাটে এনে তাকে চিতায় শয়ন করান হয়। ইতিমধ্যে আমাদের সেই দয়াবতী প্রতিবেশিনী তথায় উপস্থিত হন। তিনি বাটী হইতে কিছু অর্থ আনিতে গিয়াছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা খারাপ দেখিয়া তার আগের রাত্রে আমি ও ভ্রাতৃবধূ সেইখানেই ছিলাম। এর ভিতরে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রক্ষা হয়। ভ্রাতার সৎকারের জন্য আমার মাতামহী ও সেই প্রতিবেশিনী যখন ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় মা আমার আস্তে আস্তে গঙ্গার জলে কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। আমি মা'র কাপড় ধরিয়া খুব চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকায় আমার দিদিমাতা দৌড়াইয়া আসিয়া মাতাকে ধরিয়া লইয়া যান। ইহার পর মা আমার অনেক দিন অর্দ্ধ-উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। মোটে কাঁদিতেন না, বরং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেন। সে কারণ আমার দিদিমাতা বড়ই সাবধান ছিলেন। মায়ের সম্মুখে কাহাকেও আমার ভ্রাতার কথা কহিতে দিতেন না। যদিও আমার দিদিমাতা আমাদের সকলের অপেক্ষা আমার ভ্রাতাকেই অধিক স্নেহ করিতেন, কেন না আমাদের বংশে পুত্র সন্তান কখন হয় নাই : মেয়ের মেয়ে, তাহার মেয়ে নিয়েই সব ঘর। কিন্তু নিজ কন্যার অবস্থা দেখিয়া একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে আমরা সকলে শুইয়া আছি, আমার মা "ওরে বাবারে কোথা গেলিরে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার দিদিমাতা বলিলেন, "আঃ বাঁচলেম।" আমি 'মা মা' করিয়া উঠিতে দিদিমাতা বলিলেন, যে, "চুপ—চুপ উহাকে কাঁদিতে দে", আমি ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমারও বড় কান্না আসিতে লাগিল।

শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথাও যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড একটী সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ-আর আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটী আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি যে আমার একজন মাস্-শাশুড়ী ছিলেন ; তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। লোক পরম্পরায় শুনিতাম যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন, এক্ষণে তিনিও আর সংসারে নাই। আমার ভ্রাতার জীবদ্দশায় আমার স্বামীকে আনিবার জন্য

কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। আমি একটি মাত্র কন্যা বলিয়া মাতামহীর ও মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমাদের বাটীতেই থাকেন। কেন না তিনিও আমাদের ন্যায় দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁহার স্বামী আর আসিতে দেন নাই।

এই তো গেল আমার বালিকা কালের কথা; পরে যখন আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিয়া বাস করেন। আমাদের বাটীতে একখানি পাকা একতলা ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যাসদৃশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা হইয়াছিলেন। তখনকার বালিকা-সুলভ-স্বভাববশতঃ তাঁহার সহিত আমার "গোলাপ ফুল" পাতান ছিল; আমরা উভয়ে উভয়কে "গোলাপ" বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনিও নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট কন্যা স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি সমভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। সময়ের গতিকে এবং অবস্থা ভেদে পরে যদিও আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইত, তথাপি সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ছিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়া ভুলিয়া যায় ও স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি"—ষ্টারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও অহঙ্কারশূন্যা ছিলেন। সেই উন্নত হৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গাগতা গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

আমাদের আর কোন উপায় না দেখিয়া আমার মাতামহী উক্ত বাইজীর নিকটেই আমায় গান শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তখন আমার বয়ঃক্রম ৭ বা ৮ বৎসর এমনই হইবে। আমার তখন গীত বাদ্য যত শিক্ষা করা হউক বা না হউক তাঁহার নিকট যে সকল বন্ধুবান্ধব আসিতেন, তাঁহাদের গল্প শুনা একটী বিশেষ কাজ ছিল। আর আমি একটু চালাক চতুর ছিলাম বলিয়া আমাকে সকলে আদর করিতেন। তখন বালিকা-সুলভ-চপলতাবশতঃ

তাঁহাদের আদর আমার ভালো লাগিত। কি করিতাম, কি করিতেছি, ভালো কি মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু খুব বেশী মিশিতাম না; কেমন একটা লজ্জা বা ভয় হইত। দূরে দূরে থাকিতাম, কেন না আমি বাল্যকাল হইতে আমাদের বাটীর ভাড়াটিয়াদের রকম সকমের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণ ছিলাম, যাহারা আমাদের খোলার ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল: তাহারা যদিও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় ঘর সংসার করিত; দিন আনিত দিন খাইত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামারি করিত যে দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর তাহাদের কখনও বাক্যালাপ হইবে না। কিন্তু দেখিতাম যে পরক্ষণেই পুনরায় উঠিয়া আহারাদি হাস্য পরিহাস করিত। আমি যদিও তখন অতিশয় বালিকা ছিলাম, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতাম! মনে হইত, আমি তো কখনও এরূপ ঘৃণিত হইব না। তখন জানি নাই যে আমার ভাগ্য দেবতা আমার মাথার উপর কাল্ মেঘ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। তখন মনে করিতাম বুঝি এমনি মাতৃকোলে সরল সুখময় হৃদয় লইয়া চিরদিন কাটিয়া যাইবে। সেই মনোভাব লইয়া আমার বাল্যসখীর বন্ধুদের সহিত বাহিরে বাহিরে আনন্দ করিয়া খেলা করিয়া, রাত্র হইলে স্নেহময়ী জননীর কোলে শুইয়া আনন্দ লাভ করিতাম। আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, গঙ্গামণির ঘরে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠ বলিয়া দুইটী ভদ্রলোক তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রায়ই আসিতেন; শুনিতাম তাঁহারা নাকি কোনখানে "সীতার বিবাহ" নামে গীতিনাট্য অভিনয় করিবার মানস করিয়াছিলেন। তিনি একদিন আমার মাতামহীকে ডাকিয়া বলিলেন যে "তোমাদের বড় কষ্ট দেখিতেছি তা তোমার এই নাতনীটিকে থিয়েটারে দিবে? এক্ষণে জলপানি-স্বরূপ কিছু কিছু পাইবে, তারপর কার্য্য শিক্ষা করিলে অধিক বেতন হইতে পারিবে।" তখন সবে মাত্র দুইটী থিয়েটার ছিল, একটী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" দ্বিতীয় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বেঙ্গল থিয়েটার"। আমার দিদিমাতা দুই চারিটী লোকের সহিত পরামর্শ করিলেন, অবশেষে পূর্ণবাবুর মতে থিয়েটারে দেওয়াই স্থির হইল। তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত "ন্যাশন্যাল থিয়েটারে" দশ টাকা মাহিনাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গঙ্গা বাইজী যদিও একজন সুদক্ষ গায়িকা ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়া কিছুমাত্র জানিতেন না; সেইজন্য আমার থিয়েটারে প্রবেশের বহুদিন পরে তিনি সামান্য মাত্র লেখাপড়া

শিখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

এই সময় হইতে আমার নূতন জীবন গঠিত হইতে লাগিল। সেই বালিকা বয়সে, সেই সকল বিলাস বিভূষিত লোকসমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য্য, সকলই আমার নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম, প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। সাংসারিক কষ্ট মনে করিয়া আরও আগ্রহ হইত। মাতার শোকদুঃখপূর্ণ মুখখানি মনে করিয়া আরও উৎসাহ বাড়িত। ভাবিতাম যে মায়ের এই দুঃখের সময় যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে সাংসারিক কষ্টও লাঘব হইবে।

যদিও রঙ্গালয়ে শিক্ষামত কার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু আমার মনের ভিতর কেমন একটা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা সতত ঘুরিয়া বেড়াইত। মনে ভাবিতাম, যে আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব! আমার মন সকল সময়েই সেই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন সবে মাত্র চারিজন অভিনেত্রী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ছিলেন। রাজা, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী ও নারায়ণী। ক্ষেত্রমণি আর ইহলোকে নাই। সে একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিল। তাহার অভিনয় কার্য্য এত স্বাভাবিক ছিল যে লোকে আশ্চর্য্য হইত, তাহার স্থান আর কখন পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ! "বিবাহ-বিভ্রাটে" ঝীর অংশ অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং "ছোটলাট টমসন" বলিয়াছিলেন যে এ রকম অভিনেত্রী আমাদের বিলাতেও অভাব আছে। চৌরঙ্গীর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এক সময় অনেক বড় বড় সাহেব ও বাঙ্গালীর অধিবেশন হইয়াছিল, সেই খানেই আমাদের থিয়েটারে 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয় হয়, তাহার অভিনয় ছোট লাটসাহেব দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহাশয় অধিক আর বলিতে সাহস হইতেছে না। যে হেতু সেই গত জীবনের নিরস ও বাজে কথা শুনিতে হয় তো আপনার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সেইজন্য এইখানে বন্ধ করিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমি অতি অল্প সময় মধ্যেই তাঁহাদের ন্যায় সমান অংশ অভিনয় করিতে পারিতাম।

দ্বিতীয় পল্লব

রঙ্গালয়ে

মহাশয়!

আপনার যে এখনও আমার জীবনের দুঃখময় কাহিনী শুনিতে ধৈর্য্য আছে, ইহা কেবল আমার উপর মহাশয়ের অপরিমিত স্নেহের পরিচয়।

আপনি ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন যে, প্রতি চরিত্র অভিনয়ে আমি মানুষের মনে দেবভাব অঙ্কিত করিয়াছি। দর্শক অভিনয় দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন ও মনঃসংযোগে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে দেব-ছবি অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অবকাশ হয় তবে বুঝাইয়া দিবেন। এক্ষণে যদি ধৈর্য্য থাকে তবে আমার নাটকীয় জীবন শুনুন!

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। সে স্থান যদিও আমার বিশেষ স্মরণ নাই, তবুও অল্প অল্প মনে পড়ে। বড়ই রমণীয় স্থান ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ী ও বারান্দা, নীচে গঙ্গার বড় বাঁধান ঘাট; দুই ধারে অন্তিমপথ-যাত্রীদিগের বিশ্রাম ঘর। সেই বালিকা কালের সেই রমণীয় ছবি দূর স্মৃতির ন্যায় এখনও আমার মনোমধ্যে জাগিয়া আছে, কেমন গঙ্গা কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইত। আমি সেই টানা-বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার মনে কত আনন্দ, কত সুখ-স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিত। বালিকা বলিয়াই হউক, কিম্বা শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়াই হউক, সকলে আমাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। আমরা যে তখন বড় গরীব ছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ঐ নিজের একটী বসত বাটী ছাড়া ভাল কাপড় জামা বা অন্য দ্রব্যাদি কিছুই ছিল না। সেই সময়ে "রাজা" বলিয়া যে প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন, তিনি আমায় ছোট হাত-কাটা দুটী ছিটের জামা তৈয়ারী করাইয়া দেন। তাহা পাইয়া আমার কত যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই জামা দুইটীই আমার শীতের সম্বল ছিল। সকলে বলিত যে এই মেয়েটীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে বোধ হয় খুব কাজের লোক হইবে। তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা

দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় "বেণী-সংহার" পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বই এর ড্রেস-রিহার্সাল হয়, সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেননা—রিহার্সাল বাড়ীতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোকও থাকিত।

কিন্তু যে দিন পার্ট লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে ষ্টেজে বাহির হইতে হইল, সে দিন হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব। সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, পা দুটীও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই সকল উজ্জ্বল দৃশ্য যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভিতর হইতে অধ্যক্ষেরা আমায় আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ভয়, ভাবনা ও মনের চঞ্চলতার সহিত কেমন একটা কিসের আগ্রহও যেন মনের মধ্যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহা কেমন করিয়া বলিব? একে আমি অতিশয় বালিকা, তাহাতে গরীবের কন্যা, কখনও এরূপ সমারোহ স্থানে যাইতে বা কার্য্য করিতে পাই নাই। বাল্যকালে কতবার মাতার মুখে শুনিতাম ভয় পাইলে হরিকে ডাকিও, আমিও ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, যে কয়টী কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুচারুরূপে ও সেইরূপ ভাবভঙ্গীর সহিত বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। ভয়েই হউক, আর উত্তেজনাতেই হউক, আমার তখনও গা কাঁপিতেছিল। ভিতরে আসিতে অধ্যক্ষেরা কত আদর করিলেন। কিন্তু তখন করতালির কি মর্ম্ম তাহা জানিতাম না। পরে সকলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে আনন্দে করতালি দিয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পরেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের "হেমলতা" নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

আমার পার্ট শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া সকলে বলিত যে এই মেয়েটী হেমলতার পার্ট ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে। এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেইসঙ্গে মদনমোহন বর্ম্মণ অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। বহুদিন যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাদম্বিনী অভিনয় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অবসরপ্রাপ্তা। এই "হেমলতা" অভিনয় শিক্ষা দিবার সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি যখন কার্য্য স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতাম, সেই সকল কার্য্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাব ভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারিদিকে ঘেরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেই দিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুর ভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথমবারের মত ভয় হইল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সে দিন আমি রাজকন্যার অভিনয় করিব কিনা— তকৃতকে ঝকৃঝকে উজ্জ্বল পোষাক দেখিয়া ভারি আমোদ হইল। তেমন পোষাক পরা দূরে থাক্, কখন চক্ষেও দেখি নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরের দয়াতে আমি "হেমলতা"র পার্ট সুচারুরূপে অভিনয় করিলাম। তখন হইতে লোকে বলিত যে "ইহার উপর ঈশ্বরের দয়া আছে।" আর আমারও এখন বেশ মনে হয়, যে আমার ন্যায় এমন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বালিকা ঈশ্বর অনুগ্রহ ব্যতীত কেমন করিয়া সেরূপ দুরূহ কার্য্য সমাপন করিয়াছিল। কেননা আমার কোন গুণ ছিল না। তখন ভাল লেখাপড়াও জানিতাম না, গান ভাল জানিতাম না। তবে শিখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল।

সেই সময় হইতে আমি প্রায় প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্ত্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের বয়সে সমান না হইলেও অল্পদিনে কাজে তাঁহাদের সমান হইয়া ছিলাম। ইহার কয়েক মাস পরেই "গ্রেট

ন্যাশন্যাল" থিয়েটার কোম্পানী পশ্চিম অঞ্চলে থিয়েটার করিতে বাহির হন, এবং আমার আর পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করেন। পশ্চিমে থিয়েটার করিবার সময় দু'একটী ঘটনা শুনুন,—যদিও সে ঘটনা শুধু আমার সম্বন্ধে নয় তবুও তাহা কৌতুহলকর।

একরাত্রি লক্ষ্ণৌ নগরে ছত্রমণ্ডিতে আমাদের "নীলদর্পণ" অভিনয় হইতেছিল, সেই দিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ছিলেন। যে স্থানে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া রোগ সাহেবকে মারে, সেই সময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একে তো "নীলদর্পণ" পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল; তাহাতে বাবু মতিলাল সুর—তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয়—মিষ্টার রোগ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত! এইরূপ কারণে আমাদের কান্না, অধ্যক্ষদিগের ভয়, আর ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের কাঁপুনি!! তারপর অভিনয় বন্ধ করিয়া, পোষাক আস্‌বাব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া বাসায় এক রকম পলায়ন!! পরদিন প্রাতেই লক্ষ্ণৌ নগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়েন!!!

ইহার পরে আমরা যদিও অনেক স্থানে গিয়াছিলাম কিন্তু সব কথা আমার মনে নাই, তবে দিল্লীতে মাছির ঘর, বিছানা ব্যতীত কিছুই দেখা যাইত না! এবং সেই প্রথম ভিস্তির জলে স্নান করিতে আমার আপত্তি, মাতার ক্রমাগত রোদন দেখিয়া, আমার মাকে একটী ইঁদারার জল নিজ হাতে তুলিয়া স্নান আহার করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমাদের ভিস্তির জলই বন্দোবস্ত। দিল্লীতে আর একটী ঘটনা হয় তাহা ক্ষুদ্র হইলেও আমার বেশ মনে আছে। দিল্লীর বাড়ীর খোলা ছাদে আমি একদিন ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতে ছিলাম। কি কারণে মনে নাই, কাদম্বিনীর তাহা অসহ্য হওয়ায় আমার হাত ধরিয়া আমার গালে দুই চড় মারেন, সেই দিন আমরা মায়ে ঝীয়ে সারাদিন কাঁদিয়া ছিলাম। মা আমার মনের দুঃখে কিছু খান নাই, আমিও মায়ের কাছে সমস্ত দিন বসিয়া ছিলাম, শেষে বৈকালে

থিয়েটারের বাবুরা আমায় জোর করাইয়া আহার করান। আমার মা কিন্তু সে দিন কিছুই আহার করিলেন না। একে তো দিল্লী সহরে মুসলমানের বাড়াবাড়ি দেখিয়া মা আমার ক্রমাগতই কাঁদিতেন, কি করিবেন, একে আমরা গরীব তাহাতে আমি বালিকা, যদিও কর্তৃপক্ষেরা যত্ন করিতেন, তবুও বড় অভিনেত্রীরা নিজের গণ্ডা নিজে বুঝিয়া লইতেন, আমার দয়ার উপর নির্ভর ছিল। আর কি কারণে জানিনা, সকলের অপেক্ষা কাদম্বিনী যেন কিছু অহঙ্কৃতা ছিলেন, আমার উপর কেমন তার দ্বেষ ছিল, প্রায়ই দূর ছাই করিতেন। তারপর বোধ হয় আমাদের লাহোরে যাইতে হয়। লাহোরে আমাদের বেশী দিন থাকিতে হয়; সেখানে অনেকগুলি বই অভিনয় হইয়াছিল। আমি নানা রকম পার্ট অভিনয় করিয়া ছিলাম। "সতী কি কলঙ্কিনী"তে রাধিকা, "নবীন তপস্বিনী"তে কামিনী, "সধবার একাদশী"তে কাঞ্চন, "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে ফতি—কত বলিব। তবে বলিয়া রাখি যে, সে সময় আমার এত অল্প বয়স ছিল যে বেশ করিবার সময় বেশকারীদের বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইত। আমার মত একটী বালিকাকে কিশোর বয়স্কা বা সময় সময় প্রায় যুবতীর বেশে সজ্জিত করিতে তাহারা সময়ে সময়ে বিরক্ত হইত—তাহা বুঝিতাম। আবার কখন কখন সকলে তামাসা করিয়া বলিত যে" তোকে কামার দোকানে পাঠাইয়া দিয়া পিটিয়া একটু বড় করিয়া আনাইব।" লাহোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপ সিংহ বলিয়া একজন বড় জমীদার মহাশয়ের খেয়াল উঠিল, যে তিনি আমায় বিবাহ করিবেন এবং যত টাকা লইয়া আমার মাতা সন্তুষ্ট হন তাহা দিবেন। পূর্ব্বোক্ত জমীদার মহাশয় অর্দ্ধেন্দুবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবুকে বড়ই পিড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তখন উঁহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি নাকি সেখানকার একটী বিশেষ বড়লোক। একে বিদেশ—উপরান্ত এই সকল কথা শুনিয়া আমার মা তো কাঁদিয়াই আকুল। আমিও ভয়ে একেবারে কাঁটা। এই উপলক্ষে আমাদের শীঘ্রই লাহোর ছাড়িতে হয়। ফিরিবার সময় আমরা ৺শ্রীশ্রী বৃন্দাবন ধাম দিয়া আসিয়া ছিলাম। ৺শ্রীবৃন্দাবন ধামে আবার আমি একটী বিশেষ ছেলে মানুষি করিয়া ছিলাম। তাহা এই :—

থিয়েটার কোম্পানী সেই দিন ৺শ্রীধামে পৌঁছিয়া চল্লিশ জন লোকের জলখাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাঁহারা ৺শ্রীজীউদিগের দর্শন

করিতে গেলেন এবং আমাকে বলিয়া যান যে "তুমি ছেলে মানুষ, এখনই এই গাড়ীতে আসিলে, এখন জল খাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাক। আমরা দেবতা দর্শন করিয়া আসি।" আমি বাসায় দরজা বন্ধ করিয়া রহিলাম। তাঁহারা সকলে ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন জন্য চলিয়া গেলেন। আমার একটু রাগ ও দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কি করিব? মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া রহিলাম। ঘরের দরজা দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় একটা বাঁদর আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। আমি বালিকা-সুলভ-চপলতা বশতঃ তাহাকে একটী কাঁকড়ি খাইতে দিলাম, সে খাইতেছে এমন সময় আর দুইটা আসিল, আমি তাহাদেরও কিছু খাবার দিলাম, আবার গোটা দুই আসিল, আমি মনে ভাবিলাম যে ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চার পাঁচটী জানালা, আমি যত আহার দিই, ততই জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার বড় ভয় হইল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল প্রায় তার সকলই তাহাদের দিতে লাগিলাম। আর মনে করিতে লাগিলাম যে এই বারেই তারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল, বানরের দল তত বাড়িতে লাগিল। আর আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাদের ক্রমাগত আহার দিতে লাগিলাম। ইতমধ্যে কোম্পানীর লোক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বানরে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা লাঠি ইত্যাদি লইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া আমায় দরজা খুলিতে বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল কথা তাঁহাদের বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আমার মা আমায় দুটী চড় মারিলেন ও কত বকিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি যে অত ক্ষতি করিয়াছিলাম, তবু কোম্পানীর সকলে হাসিয়া মাকে মারিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন যে "মারিও না, ছেলে মানুষ ও কি জানে? আমাদের দোষ, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই হইত!" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন "বোকা মেয়ে আমাদের সকল খাবার বিলাইয়া ব্রজবাসীদিগের ভোজন করাইলি, এখন আমরা কি খাই বল্ দেখি?" আবার জলখাবার খরিদ করিয়া আনা হইল, তবে তাঁহারা জল খাইলেন। ঐ কথা লইয়া নীলমাধববাবু আমায় দেখা হইলেই এখনও তামাসা করিয়া বলিতেন যে "৺বৃন্দাবনে গিয়া বাঁদর ভোজন করাবি বিনোদ!" নীলমাধব চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় নাট্যজগতে বিশেষ সুপরিচিত! সকলেই তাঁহার নাম জানেন।

তিনিও আমাদের সঙ্গে পশ্চিমে ছিলেন, তিনি আমায় অতিশয় যত্ন করিতেন। দিল্লীতে যখন সব একট্রেসরা চাদর, জামা, কাপড় নিজ নিজ পয়সায় খরিদ করেন, আমার পয়সা ছিল না বলিয়া কিনিতে না পারায় তিনি আমায় একখানি ফুল দেওয়া চাদর ও কাপড় কিনিয়া দেন। সেই তখনকার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার স্নেহের জিনিষ আমার কতদিন ছিল। আর একটী প্রথম উপহার, একটী অকৃত্রিম স্নেহময় বন্ধুর প্রদত্ত আমার বড় আদরের হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর ডাক্তার মহাশয় তিনি একটী ঢাকার গঠিত রূপার ফুল ও খেলিবার একটী কাঁচের ফুলের খেলনা আমায় দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্নেহময় উপহার আমার সেই বালিকা কালে বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। নিঃস্বার্থ স্নেহে বশীভূত হইয়া আমি এখনও তাঁ'র দয়া অনুগ্রহ দ্বারা ও দায় বিদায়ে রোগে শোকে সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। তাঁহার অকৃত্রিম অনুগ্রহে আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী। এই বহু সম্মানিত ডাক্তারবাবু মহাশয় এই অভাগিনীর চির ভক্তির পাত্র। এই রূপেই আমার বাল্যকালের নাট্যজীবন।

ইহার পর আমরা কলিকাতা চলিয়া আসি। তার পর বোধহয় পাঁচ ছয় মাস পরে "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আমি মাননীয় ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫৲ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। তখনও যদিচ আমি বালিকা কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কার্য্য-তৎপরা এবং চালাক চটপটে হইয়া ছিলাম। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। এইখান হইতেই আমার অভিনয় কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান। সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাননীয় স্বর্গগত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অতুলনীয় স্নেহ মমতা। তিনি আমায় এত অধিক যত্ন করিতেন, বোধহয় নিজ কন্যা থাকিলেও এর অধিক স্নেহ পাইত না।

মহাশয়ের আমার উপর অসীম করুণা ছিল, সেই কারণে বলিতে সাহস করিতেছি। যদি অনুমতি করেন তবে বেঙ্গল থিয়েটারে যে কয়েক বৎসর অভিনয় কার্য্য করিয়া ছিলাম, সেই সময়ের ঘটনাগুলি বিবৃত করি।

বেঙ্গল থিয়েটারে

কৈশোরে পদার্পণ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ পূজনীয় ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হই। ঠিক মনে পড়ে না, কি কারণবশতঃ আমি "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার ত্যাগ করি। এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের উন্নতির মূল; এই স্থানে ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূমিকা অভিনয় করিতে আরম্ভ করি। মাননীয় শরৎবাবু আমায় কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার অসীম স্নেহ ও গুণের কথা আমি একমুখে বলিতে পারি না। প্রসিদ্ধা গায়িকা বনবিহারিণী (ভুনি), সুকুমারী দত্ত (গোলাপী) ও এলোকেশী সেই সময় "বেঙ্গলে" অভিনেত্রী ছিলেন। তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়ার্থে প্রস্তুত হইতে ছিল। আমি উক্ত "মেঘনাদ বধ" কাব্যে সাতটী পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলাম। ১ম চিত্রাঙ্গদা, ২য় প্রমীলা, ৩য় বারুণী, ৪র্থ রতি, ৫ম মায়া, ৬ষ্ঠ মহামায়া, ৭ম সীতা। বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনীতে" মনোরমা অভিনয়ই করিতাম এবং "দুর্গেশনন্দিনীতে" আয়েষা ও তিলোত্তমা এই দুইটি ভূমিকা প্রয়োজন হইলে দুইটিই একরাত্রি একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছি। কারাগারের ভিতর ব্যতীত আয়েষা ও তিলোত্তমার দেখা নাই। কারাগারে তিলোত্তমার কথাও ছিল না অন্য একজন তিলোত্তমার কাপড় পরিয়া কারাগারে গিয়া "কে-ও—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা?" জগৎ সিংহের মুখে এইমাত্র কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। আর সেই সময়েই আয়েষার ভূমিকার শ্রেষ্ঠ অংশ ওস্মানের সহিত অভিনয়! এই অতি সঙ্কুচিতা ভীরু-স্বভাবা রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনি আবার উন্নত-হৃদয়া-গর্ব্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাব পুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুইভাগে নিজেকে বিভক্ত করিতে কত যে উদ্যম প্রয়োজন তাহা বলিবার নহে। ইহা যে প্রত্যহ ঘটিত তাহা নহে, কার্য্যকালীন আকস্মিক অভাবে এইরূপে কয়েকবার অভিনয় করিতে হইয়াছিল।

একদিন অভিনয় রাত্রিতে আয়েষা সাজিবার জন্য গৃহ হইতে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া অভিনয় স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যিনি "আসমানির" ভূমিকা অভিনয় করিবেন তিনি উপস্থিত নাই। রঙ্গালয় জনপূর্ণ! কর্ত্তৃপক্ষগণের ভিতর চুপি চুপি কথা হইতেছে—"কে বিনোদকে 'আসমানির' পার্ট অভিনয় করিতে বলিবে? উপস্থিত বিনোদ ব্যতীত অন্য কেহই পারিবে না!" আমি বাটী হইতে একেবারে আয়েষার পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই বলিতেছেন না। এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু আসিয়া অতি আদর করিয়া বলিলেন, "বিনোদ! লক্ষ্মী ভগ্নিটী আমার! আসমানি যে সাজিবে তাহার অসুখ করিয়াছে, তোমায় আজ চালাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি"। যদিও মুখে অনেকবার "না—পারিব না" বলিয়া ছিলাম বটে, আর বাস্তবিক সেই নবাব পুত্রীর সাজ ছাড়িয়া তখন দাসীর পোষাক পরিতে হইবে, আবার "আয়েষা" সাজিতে অনেক খুঁত হইবে বলিয়া মনে মনে বড় রাগও হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করিবার সময় "ইংলিসম্যান", "ষ্টেটস্‌ম্যান" ইত্যাদি কাগজে আমায় কেহ "সাইনোরা" কেহ কেহ বা "ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ ষ্টেজ" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এখনও আমার পূর্ব্ব বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা বলেন, যে "সাইনোরা" ভাল আছ তো!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই থিয়েটারে বঙ্কিম বাবুর "মৃণালিনী" অভিনীত হইত। তাহার অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখনকার বা এখনকার কোন রঙ্গালয়ে এ পুস্তকের এরূপ অভিনয় বোধহয় কোথাও হয় নাই। এই মৃণালিনীতে হরি বৈষ্ণব—হেমচন্দ্র, কিরণ বাঁড়ুয্যে—পশুপতি, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত)—গিরিজায়া, ভুনী—মৃণালিনী এবং আমি—মনোরমা!

আর গোটাকয়েক কথা বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটার সম্বন্ধে কথা শেষ করিব। একবার আমরা সদলবলে চুয়াডাঙ্গা যাই, আমাদের জন্য একখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি! মাস—স্মরণ নাই, মাঝখানে কোন্ ষ্টেশনে তাও মনে নাই, তবে সে যে একটী বড় ষ্টেশন সন্দেহ নাই। সেইস্থানে নামিয়া "উমিচাঁদ" বলিয়া ছোটবাবু মহাশয়ের একজন আত্মীয় (আমরা মাননীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ছোটবাবু বলিয়া ডাকিতাম) ও আর দুই চারিজন একত্র আমাদের কোম্পানীর জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার, পাতা ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন, উমিচাঁদ বাবুর

আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ছোটবাবু মহাশয় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া "ওহে উমিচাঁদ শীঘ্র এস—শীঘ্র এস—গাড়ী যে ছাড়িল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় গাড়ীও একটু একটু চলিতে লাগিল,ইত্যবসরে দৌড়িয়া উমিচাঁদ বাবু গাড়ীতে উঠিলেন,গাড়ীও জোরে চলিল। এমন সময় উমিচাঁদ বাবু অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছোটবাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে "সর্দিগরমি হইয়াছে, জল দাও জল দাও" করিতে লাগিলেন, চারুচন্দ্র বাবু ব্যস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে সমস্ত গাড়ীখানার ভিতর একটী লোকের কাছে, এমন কি এক গণ্ডুষ জল ছিল না, যে সেই আসন্ন—মৃত্যুমুখে পতিত লোকটীর তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। "ভুনি" তখন সবে মাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কোলে ছোট মেয়ে; সে সময় অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আপনার স্তন্য দুগ্ধ একটী ঝিনুকে করিয়া লইয়া উমিচাঁদের মুখে দিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। বোধহয় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। গাড়ী শুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ছোটবাবু মহাশয় উমিচাঁদের বুকে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি একে বালিকা, তাহাতে ওরকম মৃত্যু কখন দেখি নাই, ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম। উমিচাঁদ বাবুর মৃত্যুকালীন সেই মুখভঙ্গী আমার মনোক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। আমার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু মহাশয় ছোট বাবুকে বলিলেন, "শরৎ থাম, যাহা হইবার হইয়াছে ; এখন যদি রেলের লোক এ ঘটনা জানিতে পারে, গাড়ী কাটিয়া দিবে, এত লোকজন লইয়া রাস্তার মাঝে আর এক বিপদ হইবে।" ছোটবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি উমির মা'কে গিয়া কি বলিব ? সে আসিবার কালীন উমিচাঁদ সম্বন্ধে কত কথা যে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল।" (উমিচাঁদ বাবু মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন)। যাক্ এই রকম ভয়ানক বিপদ ঘাড়ে করিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় চুয়াডাঙ্গায় নামিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সেখানের স্টেশন মাস্টারকে বলা হইল যে এই আগের স্টেশনে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। তারপর আমরা বাসায় গিয়া যে যেখানে পাইলাম, অবসন্ন হইয়া সে রাত্রে শুইয়া পড়িলাম। ছোটবাবু ও দুই চারিজন অভিনেতা শব দাহ করিতে যাইলেন। সেখানে তিন দিন থাকিয়া অভিনয় কার্য্য সারিয়া সকলে অতি বিষন্ন ভাবে কলিকাতায় ফিরিলাম। এই শোকপূর্ণ ঘটনাটি কোন যোগ্য লেখকের দ্বারা বর্ণিত লইলে সে ভীষণ ছবি কতক পরিমাণে পরিস্ফুট হইত।

আর একবার একটী ঘোর. বিপদে পড়ি। সেও বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত সাহেবগঞ্জ না কোথায় একটী জঙ্গলা দেশে যাইতে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে কতকটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ও গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। ৪টী হাতী ও কয়েকখানি গোরুর গাড়ী আমাদের জন্য প্রেরিত হয়। যাহারা যাহারা গোরুর গাড়ীতে যাইবে, তাহারা তিনটার সময় চলিয়া গেল। আমি ছেলে মানুষির ঝোঁকের বলিলাম, যে "আমি হাতীর উপর যাইব।" ছোটবাবু মহাশয় কত বারণ করিলেন। কিন্তু আমি হাতী কখন দেখি নাই! চড়া তো দূরের কথা! ভারি আমোদ হইল, আমি গোলাপকে বলিলাম, "দিদি আমি তোমার সঙ্গে হাতীতে যাইব।" গোলাপ বলিল, "আচ্ছা,—যাস্!" সে আমায় তার সঙ্গে রাখিল। মা বকিতে বকিতে আগে চলিয়া গেলেন। আমরা সন্ধ্যা হয় এমন সময় হাতীতে উঠিলাম। আমি, গোলাপ ও আর দুইজন পুরুষ মানুষ একটাতে, আর চারিজন করিয়া অপর তিনটাতে। কিছু দূর গিয়া দেখি, এমন রাস্তা তো কখন দেখি নাই। মোটে এক হাত চওড়া রাস্তা! আর দুইধারে বুক পর্য্যন্ত বন! ধান গাছ কি অন্য গাছ বলিতে পারিনা—আর জল! ক্রমে যতই রাত্রি হইতে লাগিল ততই বৃষ্টি চাপিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। হাতী তো ফর্ ফর্ করিতে লাগিল। শেষে সকলকে বেত বনের মধ্যে লইয়া ফেলিল। তার উপর শিলা বৃষ্টি! হাতীর উপর ছাউনী নাই, সেই জল, ঝড়, মেঘ গর্জ্জন, তার উপর শিলা বর্ষণ, আমি কেঁদেই অস্থির! গোলাপও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হাতী আর এগোয় না। শুঁড় মাথার উপর তুলিয়া আগের পা বাড়াইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তখন মাহুত বলিল, যে বাঘ বেরিয়েছে তাই হাতী যাইতেছে না।" মাহুত চারিজন হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। আমি তো আড়ষ্ট, আমার হাতী চড়ার আমোদ মাথায় উঠিয়াছে। ভয়ে কেঁদে কাঁপিতে লাগিলাম; পাছে হাতীর উপর হইতে পড়িয়া যাই বলিয়া একজন পুরুষ মানুষ আমায় ধরিয়া রহিল। তাহার পর কত কষ্টে প্রায় আধমরা হইয়া আমরা কোন রকমে বাসায় পৌঁছিলাম। জলে শীতে আমরা এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম, যে হাতী হইতে নামিবারও ক্ষমতা ছিল না! ছোট-বাবু নিজে ধরিয়া নামাইয়া নিয়া আগুন করিয়া আমার সমস্ত গা সেঁকিতে লাগিলেন। মা তো বকিতে বকিতে কান্না জুড়িলেন। মার বুলিই ছিল "হতচ্ছাড়া মেয়ে কোন কথা শোনে না।" সেই দিনই আমাদের অভিনয়ের কথা ছিল, কিন্তু দুর্য্যোগের জন্য ও আমাদের শারীরিক অবস্থার জন্য সেদিন বন্ধ রহিল।

আর একবার নৌকাতে বিপদে পড়িয়াছিলাম—আর একবার পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া ঝড়ের মাঝে পড়িয়া পথ হারাইয়া পাহাড়ীদের কুটীরে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করি! সেই পাহাড়ীই আবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বাসায় রাখিয়া যায়।

একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ঘোড়ায় চড়িয়া অভিনয় করিতে পড়িয়া গিয়া বড়ই আঘাত লাগিয়া ছিল। "প্রমীলা"র পার্ট ঘোটকের উপর বসিয়া অভিনয় করিতে হইত। সেখানে মাটির প্লাটফরম্ প্রস্তুত হইয়াছিল, যেমন আমি স্টেজ হইতে বাহিরে আসিব, অমনি মাটির ধাপ ভাঙ্গিয়া ঘোড়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। আমিও ঘোড়ার উপর হইতে প্রায় দুই হস্ত দূরে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তখন আমার অভিনয়ের অনেক বাকী আছে—কি হইবে! চারুবাবু আমায় ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ছোটবাবু মহাশয় কত স্নেহ করিয়া বলিলেন, যে "লক্ষীটি! আজিকার কার্য্যটি কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া দাও।" তাঁহার সেই স্নেহময় সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্দ্ধেক দূর হইল। কোনরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতায় ফিরিলাম। ইহার পর আমি এক মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। যাহা হউক, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সন্তোষে কাটাইয়া ছিলাম। কেননা তখন বেশী উচ্চ আশা হয় নাই। যাহা পাইতাম তাহাতেই সুখী হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পারিতাম, সেইটুকুও যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশী আশাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। সকলে বড় ভালবাসিত। হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিন কাটাইতাম।

এই সময় মাননীয় ৺কেদারনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটারে যাইতেন। স্বর্গীয় কেদারবাবু আমার "কপালকুণ্ডলার" অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যে "এই মেয়েটি যেন প্রকৃত "কপালকুণ্ডলা" ইহার অভিনয়ে বন্য সরলতা উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

পরে শুনিয়াছিলাম এই সময়ে গিরিশবাবু মহাশয় ছোটবাবুকে বলেন, যে "আমরা একটি থিয়েটার করিব মনে করিতেছি। আপনি যদ্যপি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে দেন তবে বড়ই ভাল হয়।" ছোটবাবু মহাশয় অতি উচ্চ-হৃদয়-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিনোদকে আমি বড়ই

স্নেহ করি; উহাকে ছাড়িতে হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে। তথাপি আপনার অনুরোধ আমি এড়াইতে পারি না, বিনোদকে আপনি লউন।"

তারপর ছোটবাবু মহাশয় একদিন আমায় বলিলেন, যে "কি রে বিনোদ এখান হইতে যাইলে তোর মন কেমন করিবে না?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় লইয়া সেদিন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও বলিলেন, যে "ওসব কথা আমারও বেশ মনে আছে। তোমাকে বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আনিবার পরও শরৎবাবু মহাশয় আমাদের বলিয়া ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের বেনিফিট নাইটের "দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষার" ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য লইয়া যান; আরও কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন।" যাহা হউক, সেই সময় হইতে আমি মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার শিক্ষায় আমার যৌবনের প্রথম হইতে জীবনের সার ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে

যৌবনারম্ভে

আমি বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ন্যাশন্যাল থিয়েটারে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হই। মাসকয়েক "মেঘনাদ বধ" "মৃণালিনী" ইত্যাদি পুরাতন নাটকে এবং "আগমনী", "দোললীলা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে ও অনেক প্রহসন ও প্যান্টোমাইমে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করি। সকলগুলিই প্রায় গিরিশবাবুর রচিত। ইহার পর গিরিশবাবুর ও আমার থিয়েটারের সহিত সংস্রব শিথিল হইয়া আসে। ঐ সময় ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দুর্দ্দশা! অল্পদিনের মধ্যেই থিয়েটার নীলামে বিক্রয় হওয়ায় প্রতাপ চাঁদ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী অধিকারী হইলেন। প্রতাপচাঁদ বাবুর অধীনে থিয়েটারের নাম ন্যাশন্যাল থিয়েটারই রহিল। গিরিশবাবু পুনর্ব্বার ম্যানেজার হইলেন। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয়, স্বর্গীয় কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত "হাম্মীর"! ইহার নায়িকার ভূমিকা আমার ছিল, কিন্তু তখন ন্যাশন্যালের দুর্নাম রটিয়াছে; অতি ধূমধামের সহিত সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া অভিনয় হইলেও অধিক দর্শক আকর্ষিত হইল না। ভাল ভাল নাটক যাহা ছিল, সব পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নূতন ভাল নাটকও পাওয়া যায় না। "মায়াতরু" নামে একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য গিরিশবাবু রচনা করিলেন। "পলাশীর যুদ্ধের" সহিত একত্রিত হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়।

দুই তিন রাত্রি অভিনয়ের পরেই এই ক্ষুদ্র নাটিকার যশে দর্শক আকর্ষিত হইয়া বাড়ী ভরিয়া যাইতে লাগিল। এই গীতিনাট্যে আমার "ফুলহাসির" ভূমিকা দেখিয়া "রিজ এণ্ড রায়তের" সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন, "বিনোদিনী *was simply charming*" ক্রমে গিরিশবাবুর "মোহিনী প্রতিমা", "আনন্দ রহো" দর্শক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর "রাবণ বধের" পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না। উপরের আসন সকল প্রতিবারই পূর্ণ হইয়া যাইত, যে সকল ধনবান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঘৃণা করিয়া থিয়েটারে আসিতেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুই একদিন পূর্ব্বে টিকিট ক্রীত হইয়া অধিকৃত হইত। দিন দিন থিয়েটারের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া একদিন সত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ বলেন, "বিনোদ তিল সমাত করন্তি।" তিল সমাত অর্থে যাদু! ক্রমে "সীতার বনবাস" প্রভৃতি নাটক চলিল। থিয়েটারের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অধীনার খ্যাতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

গিরিশবাবুর সহিত থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিয়া বিডন ষ্ট্রীটের "ষ্টার থিয়েটার" শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে বরাবর কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। কার্য্য ক্ষেত্রে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা ছিলাম। তাঁহার নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্র আমিই অভিনয় করিতাম। তিনিও অতি যত্নে আমায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতেন।

যে সময় কেদারবাবু থিয়েটার করেন, সেইসময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় আসিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগ দেন। গিরিশবাবুর মুখে শুনিয়া ছিলাম, যে অমৃত মিত্র আগে যাত্রার দলে এক্‌ট করিতেন। তাঁহার গলার সুন্দর স্বর শুনিয়া তিনি প্রথমে থিয়েটারে লইয়া আসেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিপূর্বে "মেঘনাদ বধ", "বিষবৃক্ষ", "সধবার একাদশী", "মৃণালিনী", "পলাশীর যুদ্ধ" ও নানা রকম বড় অথরের বই নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। "মেঘনাদ বধে" অমৃতলাল রাবণ সাজেন এবং আমি এখানেও সাতটি অংশ অভিনয় করিতাম। গিরিশবাবু মেঘনাদ ও রাম, "মৃণালিনীতে" গিরিশবাবু পশুপতি, আমি মনোরমা, "দুর্গেশনন্দিনীতে" গিরিশবাবু জগত সিংহ, আমি আয়েষা, "বিষবৃক্ষে" গিরিশবাবু নগেন্দ্রনাথ, আমি কুন্দনন্দিনী, "পলাশীর যুদ্ধে" গিরিশবাবু ক্লাইব, আমি বৃটেনিয়া, অমৃত মিত্র জগৎ শেঠ ও

কাদম্বিনী রাণী ভবানী। কত পুস্তকের নাম করিব। সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পার্ট থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাটীতে বসিয়া, অমৃত মিত্র, অমৃতবাবু (ভুনীবাবু) আরো অন্যান্য লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি সেক্সপীয়ার. মিল্‌টন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্‌টার একট্রেস্ আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজি থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাটী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন "কি রকম দেখে এলে বল দেখি ?" আমার মনে যেমন বোধ হইত, তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আবার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

৺কেদারবাবু প্রায় বৎসরখানেক থিয়েটার করেন; ইহার পর কৃষ্ণধন ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া দুই ভাই কয়েকমাস থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার পর কাশীপুরের প্রাণনাথ চৌধুরীর বাটীর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়া একব্যক্তি ছয় মাস কি আট মাস এই থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হন। এই সকল থিয়েটারেই গিরিশবাবু মহাশয় ম্যানেজার ও মোশান মাস্টার ছিলেন। কিন্তু সকল প্রোপ্রাইটারই স্ব স্ব প্রধান, গিরিশবাবু আফিসের কার্য্য করিয়া থিয়েটারে অধিক সময় দিতে পারিতেন না। ইহাতে এত বিশৃঙ্খলা হইত যে ব্যবসা বুদ্ধিহীন আমোদপ্রিয় প্রোপ্রাইটারেরা শেষে থলি ঝাড়া হইয়া শূন্য হস্তে ইন্‌সলভেন্টের আসামী হইয়া থিয়েটার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। অথচ আমার বেশ মনে পড়ে যে সে সময় প্রতি রাত্রেই খুব বেশী লোক হইত ও

এমন সুন্দররূপ অভিনয় হইত যে লোকে অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়া একবাক্যে বলিত যে আমরা অভিনয় দর্শন করিতেছি কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা বোধ করিতে পারিতেছি না। এত বিক্রয় সত্ত্বেও যে কেন সব ধনী সন্তানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। লোকে বলিত যে এই যায়গাটা হানা যায়গা। এই স্থানের ভূমিখণ্ড কাহাকেও অনুকূল নহে।

গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন স্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ! আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত। আমার এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া রঙ্গলয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমায় বড়ই ভালবাসিতেন ও অতিশয় স্নেহ মমতা করিতেন। কেহবা কন্যার ন্যায় কেহবা ভগ্নীর ন্যায়, কেহবা সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমিও তাঁহাদের যত্নে ও আদরে তাঁহাদের উপর প্রবল স্নেহের অত্যাচার করিতাম। যেমন মা বাপের কাছে আদরের পুত্র কন্যারা বিনা কারণে আদর আবদারের হাঙ্গামা করিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত করে, ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট যেমন কোলের ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি মিছামিছি ঝগড়া আবদার করে, আমারও সেইরকম স্বভাব হইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে নানারকমের উচ্চচরিত্র অভিনয় দ্বারা আমার মন যেমন উচ্চদিকে উঠিতে লাগিল, আবার নানারূপ প্রলোভনের আকাঙ্ক্ষাতে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইবার উপক্রম হইত।

আমি ক্ষুদ্র দীন দরিদ্রের কন্যা, আমার বল বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। এদিকে আমার উচ্চবাসনা আমার আত্মবলিদানের জন্য বাধা দেয়, অন্যদিকে অসংখ্য প্রলোভনের জীবন্ত চাকচিক্য মূর্ত্তি আমায় আহ্বান করে। এইরূপ অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-হৃদয়-বল কতক্ষণ থাকে? তবুও সাধ্যমত আত্মদমন করিতাম। বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই। অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের সার সম্পদ ছিল। পার্ট অভ্যাস, পার্ট অনুযায়ী চিত্রকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে সেই সকল প্রকৃতির আকৃতি মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়া তন্ময়ভাবে সেই মনাঙ্কিত ছবিগুলিকে আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া দেখা, এমন কি সেইভাবে চলা, ফেরা, শয়ন, উপবেশন যেন আমার স্বভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস সিড্‌নিস্ যখন থিয়েটারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, দশবৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন সমালোচক কোন স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তক হইতে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ একট্রেস বিলাতে বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেণ্টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম কত বলিব গিরিশবাবু মহাশয়ের ও অন্যান্য স্নেহশীল বন্ধুগণের যত্নে ইংরাজি, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মানি প্রভৃতি বড় বড় অথরের কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম। এই কারণে আমার স্বভাব এমন হইয়া গিয়াছিল যে যদি কখন কোন উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সেখানকার ঘর বাড়ী আমার ভাল লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্প শোভিত নির্জ্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে আমি বুঝি এই বনের মধ্যে থাকিতাম, আমি ইহাদের চিরপালিত! প্রত্যেক লতাপাতায় সৌন্দর্য্যের মাখামাখি দেখিয়া আমার হৃদয় লুটাইয়া পড়িত। আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিত! কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিয়া যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা করিয়া বেড়াইতাম। এখন আমার হৃদয় ছাড়িয়া এই তরঙ্গগুলি আপনা আপনি লুটোপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কুচবিহারের নদীর বালিগুলি অভ্র মিশান, অতি সুন্দর, আমি প্রায় বাসা হইতে দূরে, নদীর ধারে একলাটী যাইয়া সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহারা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।

নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্ব্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম, কল্পনার ভিতর আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, সেইজন্য বোধ হয় আমি যখন যে পার্ট অভিনয় করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের

অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম, তাহা যে অপরের মনোমুগ্ধ করিবার জন্ত বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি ইহা আমার কখন মনেই হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ-দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, ইহা যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। সেই কারণে সকলেই আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

একদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'মৃণালিনী' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি 'মৃণালিনী'তে 'মনোরমা'র অংশ অভিনয় করিতেছিলাম। মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না, আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।" কয়েক মাস হইল এখনকার ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন যে "বিনোদ, তুমি কি সেই বিনোদ,—যাহাকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবুও বলিয়াছিলেন যে আমার মনোরমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি?" যেহেতু এক্ষণে রোগে, শোকে প্রায়ই শয্যাগত।

আমি অতি শৈশবকাল হইতে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া, বুদ্ধি বৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমায় কেমন উচ্ছ্বাসময়ী করিয়া তুলিয়াছিল, কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই বড়ই দুঃখ হইত। আমি সততই আদর ও সোহাগ চাহিতাম। আমার থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধবেরাও আমায় অত্যধিক আদর করিতেন। যাহা হউক এই সময় হইতে আমি আত্মনির্ভর করিবার ভরসা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়াছিলাম।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা বলি :—প্রতাপবাবুর থিয়েটারে আসিবার ঠিক আগেই হউক আর প্রথম সময়েই হউক, আমাদের অবস্থা গতিকে আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে থাকিতে হইত। তিনি অতিশয় সজ্জন ছিলেন; তাঁহার স্বভাব অতিশয় সুন্দর ছিল, এবং আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহগুণে আমায় তাঁহার কতক অধীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল, যে আমি থিয়েটারে কার্য্য না করি, কিন্তু যখন ইহাতে কোন মতে রাজী হইলাম না, তখন তিনি বলিলেন, তবে তুমি অবৈতনিকভাবে (এ্যামেচার) হইয়া কার্য্য কর, আমার গাড়ী ঘোড়া তোমায় থিয়েটারে লইয়া যাইবে ও লইয়া আসিবে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম,

চিরকাল মাহিনা লইয়া কার্য্য করিয়াছি। আমার মায়ের ধারণা যে থিয়েটারের পয়সা হইতে আমাদের দারিদ্র্যদশা ঘুচিয়াছে, অতএব ইহাই আমাদের লক্ষ্মী। আর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সখের মত কাজ করা হইয়া উঠিত না। হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইত, সেইজন্য সখেও বড় ইচ্ছা ছিল না। আমি একথা গিরিশবাবু মহাশয়কে বলিলাম, তিনি বলিলেন, যে "তাহাতে আর কি হইবে, তুমি "অমুককে" বলিও যে আমি মাহিনা লই না। তোমার মাহিনার টাকাটা আমি তোমার মা'র হাতে দিয়া আসিব।" যদিও প্রতারণা আমাদের চির সহচরী, এই পতিত জীবনের প্রতারণা আমাদের ব্যবসা বলিয়াই প্রতিপন্ন, তবুও আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আর আমি ঘৃণিতা বারনারী হইলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা বা মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অবিশ্বাস আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইলেও আমি সকলকেই বিশ্বাস করিতাম ও ভাল ব্যবহার পাইতাম। লুকোচুরি ভাঁড়াভাঁড়ি আমার ভাল লাগিত না। কি করিব দায়ে পড়িয়া আমায় গিরিশবাবু মহাশয়ের কথায় সম্মত হইতে হইল। উক্ত ব্যক্তির সহিত গিরিশবাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তিনি গিরিশবাবুকে বড় সম্মান করিতেন। তিনি এত সজ্জন ছিলেন যে পাছে উঁহারা কিছু মনে সন্দেহ করেন বলিয়া কাজের আগে আমায় থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিতেন। সে যাহা হউক প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতে ছিল ; তিনিও অতিশয় মিষ্টভাষী ও সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। এই স্থানে যে যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছেন, কেবল প্রতাপবাবুই ঋণগ্রস্ত হন নাই। লাভ হইয়াছিল কি না জানি না অবশ্য তাহা বলিতেন না, তবে যে লোকসান হইত না, তাহা জানা যাইত। কেন না প্রতি রাত্রে অজচ্ছল বিক্রয় হইত, আর চারিদিকে সুনিয়ম ছিল। তাঁর বন্দোবস্তও নিয়মমত ছিল। সকল রকমে তিনি যে একজন ব্যবসায়ী লোক তাহা সকলেই জানিত ও জানেন। এক্ষণে আমার উক্ত থিয়েটার ছাড়িবার কারণ ও "ষ্টার থিয়েটার" সৃষ্টির সূচনার কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করি। গিরিশবাবুর নূতন নূতন বই ও নূতন নূতন প্যান্টোমাইমে আমাদের বড়ই বেশী রকম খাটিতে হইত। প্রতিদিন অতিশয় মেহনতে আমার শরীরও অসুস্থ হইতে লাগিল, আমি একমাসের জন্য ছুটী চাহিলাম, তিনি অনেক জেদাজেদির পর ১৫ দিনের ছুটী দিলেন। আমি সেই ছুটীতে শরীর সুস্থ করিবার জন্য ৺কাশীধামে চলিয়া যাইলাম। কিন্তু সেখানে আমার অসুখ বাড়িল। সেই কারণ আমার ফিরিয়া আসিতে প্রায় এক মাস

হইল। এখানে আসিয়া পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে প্রতাপ বাবু আমার ছুটীর সময়ের মাহিনা দিতে চাহেন না। গিরিশবাবু বলিলেন যে "ছুটীর মাহিনা না দিলে বিনোদ কাজ করিবে না, তখন বড় মুস্কিল হইবে।" যদিও স্পষ্ট শুনি নাই, তবু এই রকম শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, বড় রাগ হইল। আমার একটুতে যেন মনের ভিতর আগুন লাগিয়া যাইত, আমি চোখে কিছু দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনই প্রতাপবাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মাহিনা কেয়া? তোম তো কাম নেহি—কিয়া!" আর কোথা আছে;—"বটে মাহিনা দিবেন না" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আর গেলাম না!

তারপর গিরিশবাবু, অমৃত মিত্র আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমি তখন গিরিশবাবুকে বলিলাম যে "মহাশয়, আমার বেশী মাহিনা চাহি, আর যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা চুক্তি করিয়া চাহি, নচেৎ কাজ করিব না।" তখন অমৃত মিত্র বলিলেন, "দেখ বিনোদ এখন গোল করিও না, একজন মাড়োয়ারীর সন্তান, একটি নূতন থিয়েটার করিতে চাহে; যত টাকা খরচ হয় সে করিবে। এখন কিছুদিন চুপ করিয়া থাক, দেখি কতদূর কি হয়!"

এইখান হইতেই "ষ্টার থিয়েটার" হইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। আমিও গিরিশবাবুর কথা অনুযায়ী আর প্রতাপবাবুকে কিছু বলিলাম না। তবে ভিতরে ভিতরে সংবাদ লইতে লাগিলাম কে লোক নূতন থিয়েটার করিতে চাহে?

ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা

পত্র।

মহাশয়!

এই সময় আমার অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় পতিতা ভাগ্যহীনা বারনারীদের টাল বেটাল তো সর্ব্বদাই সহিতে হয় তবুও তাহাদের সীমা আছে; কিন্তু আমার ভাগ্য চিরদিনই বিরূপ ছিল। একে আমি জ্ঞানহীনা অধম স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্য পথ সততই দোষনীয়, আমরা ভাল পথ দিয়া যাইতে চাহিলে, মন্দ আসিয়া পড়ে ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়! অথচ আমাদের প্রতি

স্নেহ চক্ষে দেখিবার বা অসময় সাহায্য করিবার কেহ নাই! যাহা হউক; আমার মর্ম্ম ব্যথা শুনুন।

আমিও এই সময় ৺প্রতাপবাবু মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগ করিব মনে মনে করিয়াছিলাম। ইহার আগে আর একটি ঘটনার দ্বারা আমায় কতক ব্যথিত হইতে হইয়াছিল। আমি যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন, ইহার কয়েক মাস আগে তিনি বিবাহ করেন ও ধনবান যুবকবৃন্দের চঞ্চলতা বশতঃ আমার প্রতি কতক অসৎ ব্যবহার করেন। তাহাতে আমাকে অতিশয় মনঃক্ষুন্ন হইতে হয়। সেই কারণে আমি মনে মনে করি যে ঈশ্বর তো আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামর্থ্য দিয়াছেন, এইরূপ শারীরিক মেহনত দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না। আমা হইতে যদি একটি থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্ন সংস্থান করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ "ষ্টার থিয়েটার" করিবার জন্য ৺গুর্ম্মুখ রায় ব্যস্ত। ইহা আমি আমাদের এক্‌টারদের নিকট শুনিলাম এবং ঘটনাচক্রে এই সময় আমার আশ্রয়দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকও কার্য্যানুরোধে দূরদেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এদিকে অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, "তুমি যে প্রকারে পার একটী থিয়েটার করিবার সাহায্য কর!" থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ! আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। গিরিশবাবু বলিলেন থিয়েটারই আমার উন্নতির সোপান। তাঁহার শিক্ষা সাফল্য আমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটার হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়। এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল। থিয়েটারের বন্ধুবর্গেরাও দিন দিন অনুরোধ করিতেছেন, আমি মনে করিলেই একটী নূতন থিয়েটার সৃষ্টি হয় তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু যে যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাকেও স্মরণ হইতে লাগিল! ক্রমে সেই যুবা অনুপস্থিত, উপস্থিত বন্ধুবর্গের কাতরোক্তি, মন থিয়েটারের দিকেই টলিল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন, অপর পুরুষে যেরূপ প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে, তাঁহারও সেইরূপ! তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিয়া

ছিলেন যে আমিই তাঁহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়! তিনি বিষয় কার্য্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় কার্য্য নয়, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তবে তাঁহার ভালবাসা কোথায়? এতো প্রতারণা! আমি কি নিমিত্ত বাধ্য থাকিব? এরূপ নানা যুক্তি হৃদয়ে উঠিতে লাগিল! কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল, যে সেই যুবার দোষ নাই, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী তবে একি করিতেছি। রাত্রে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় যাইত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রের মনোভাব একবারে ঠেলিয়া ফেলিত! থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম! কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার মন আমার সহিত প্রতারণা করে নাই। ইহা যতদূর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব তাহা পাইয়াছিলাম। কিন্তু দিন ফিরিবার নয়, দিন ফিরিল না। এ প্রমাণের কথা মহাশয়কে সংক্ষেপে পশ্চাৎ জানাইব!

থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম! কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত, তাহারাও সত্য কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্ম্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম। একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চিরপ্রথা হইলেও এ অবস্থায় আমায় বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয়তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনায় প্রত্যবায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থিরচিত্তে ভাবিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি! কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্ম্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার

অনুসন্ধান করিয়াছেন ? বিষ্ণুপরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই বারাঙ্গনা একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনি বৈষ্ণবী হন, এ কথা জগৎ ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয় শূন্য হইলে কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই। এই আমাদের সংসারের অপরাধ। নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবু মহাশয়ের যে "বারাঙ্গনা" বলিয়া একটি কবিতা আছে, তাহা এই দুর্ভাগিনীদের প্রকৃত ছবি। "ছিল অন্য নারীসম হৃদয় কমল।" অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়! আমাদেরও তাহাই! উৎপীড়িত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে। যাহা হউক, এখন ও কথা থাকুক। এই পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেননা যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সংকল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতঃই হউক, কিম্বা নিজের জেদ বশতঃই হউক, নানারূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বাধা বড় সহজ বাধা নহে! তিনি নিজের জমিদারী হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া বাড়ী ঘেরোয়া করিলেন ; গুর্ম্মুখ বাবুও বড় বড় গুণ্ডা আনাইলেন, মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। এমন কি একদিন জীবন সংশয় হইয়াছিল! একদিন রিহারসালের পর আমি আমার ঘরে ঘুমাইতে ছিলাম, ভোর ছয়টা হইবে, ঝন্ ঝন্ মস্ মস্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! দেখি যে মিলিটারি পোষাক পরিয়া তরওয়াল বান্ধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, "মেনি এত ঘুম কেন ?" আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে, বলিলেন যে,"দেখ বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সকলই দিব। এই দশ হাজার টাকা লও ; যদি বেশি হয় তবে আরও দিব।" আমি চিরদিনই একগুঁয়ে ছিলাম, কেহ জেদ করিলে আমার এমন রাগ হইত যে, আমার দিক্‌বিদিক্ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না! যাহা রোক্ করিতাম কিছুতেই তাহা টলাইতে পারিত না! মিষ্ট কথায় স্নেহের আদরে যাহা করিব স্থির করিতাম, কেহ জোর করিয়া নিষেধ করিলে, সে কাজ করিতাম না ; জোরের সহিত কাজ করান আমার সহজ সাধ্য ছিল না। তাঁহার ঐরূপ উদ্ধত ভাব দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, আমি বলিলাম, "না কখনই নহে, আমি উহাদের কথা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যতিক্রম করিতে

পারিব না।" তিনি বলিলেন "যদি টাকার জন্য হয়, তবে আমি তোমায় আরও দশ হাজার টাকা দিব।" তাঁহার কথায় আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল! দাঁড়াইয়া বলিলাম, যে "রাখ তোমার টাকা! টাকা আমি উপার্জ্জন করিয়াছি বই টাকা আমায় উপার্জ্জন করে নাই! ভাগ্যে থাকে অমন দশ বিশ হাজার আমার কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও!" আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া নিজের তরওয়ালে হাত দিয়া বলিলেন, "বটে!—ভেবেচ কি যে তোমায় সহজে ছাড়িয়া দিব, তোমায় কাটিয়া ফেলিব! যে বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতে ছিলাম তাহা অন্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে;" বলিতে বলিতে ঝাঁ করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া, চক্ষের নিমিষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন। আমার দৃষ্টিও তাঁহার তরবারির দিকে ছিল, যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত আমি অমনি একটি টেবিল হারমোনিয়ম ছিল তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম; আর সেই তরবারির চোট হারমোনিয়মের ডালার উপর পড়িয়া ডালার কাঠ তিন আঙ্গুল কাটিয়া গেল! নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া লইয়া আবার আঘাত করিলেন, তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজান হইত তাহাতে পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি উঠিয়া তাঁহার পুনঃ উদ্যত তরওয়াল শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম "কি করিতেছ, যদি কাটিতে হয় পরে কাটিও; কিন্তু তোমার পরিণাম? আমার কলঙ্কিত জীবন গেল আর রহিল তা'তে ক্ষতি কি! একবার তোমার পরিণাম ভাব, তোমার বংশের কথা ভাব, একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ছি! ছি! শুন! স্থির হও! কি করিতে হইবে বল? ঠাণ্ডা হও!" শুনিয়াছিলাম দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের প্রথম বেগ শমিত হইলে লোকের প্রায় হিতাহিত ফিরিয়া আইসে! এ তাহাই হইল, হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সে সময়ের কাতরতা বড়ই কষ্টকর! আমার মনে হইল যে সব দূরে যাউক, আমি আবার ফিরিয়া আসি। কিন্তু চারিদিক হইতে তখন আমায় অষ্ট বজ্র দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশবাবু মহাশয় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন; কোন দিকে ফিরিবার পথ ছিল না! যাহা হউক, সে হইতে তখন তো পার পাইলাম! তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন! এদিকে আমরা যে কয়জন একত্র হইয়াছিলাম সকলে ৺প্রতাপবাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম। ৺গুর্ম্মুখবাবুও

ধরিলেন যে আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে মাসকতক দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখন রানীগঞ্জে, কখন এখানে ওখানে আমায় থাকিতে হইল। ইহার ভিতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল, যে বিডন ষ্ট্রীটে প্রিয় মিত্রের যায়গা লিজ্ লইয়া এত দিন থিয়েটার হইবে, এত টাকা খরচ হইবে; তখন আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন গুর্ম্মুখবাবু বলিলেন, যে "দেখ বিনোদ! আর থিয়েটারের গোলযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট লও! অমি একেবারে তোমায় দিতেছি!" এই বলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিলেন। আমি থিয়েটার ভালবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্দ্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম। যখন অমৃত মিত্র শুনিলেন, গুর্ম্মুখ রায় থিয়েটার না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আমায় দিতে চান, তখন তাঁহাদের চিন্তার সীমা রহিল না। যাহাতে আমি সে অর্থ গ্রহণ না করি, ইহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টা তখন নিষ্প্রয়োজন। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটার ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোন মতে তাঁহার বাধ্য হইব না। তখন আমারই উদ্যমে বিডন ষ্ট্রীটে জমি লিজ্ লওয়া হইল, এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুর্ম্মুখ রায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। উক্ত বিডন ষ্ট্রীটেই বনমালী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী ভাড়া লইয়া রিহারসাল আরম্ভ হইল, তখন একে একে সব নূতন পুরাতন একটার একট্রেস আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন! গিরিশবাবু মহাশয় মাস্টার ও ম্যানেজার হইলেন এবং বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় এখনকার স্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু আসিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ্ লন, তখন বোধহয় আমরা ৺প্রতাপ বাবুর থিয়েটারে; সেই সময় কোন কারণ বশতঃ জোড়া মন্দিরের পাশে ঐ সিমলাতে আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া ছিল। সে বাড়ীতে ভুনীবাবুও প্রায়ই যাইতেন ও কার্য্যানুরোধে কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূরদেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই। পরে যখন আমাদের নূতন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু

আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন। সেই সময় প্রফেসর জহরলাল ধর আমাদের স্টেজ ম্যানেজার হন। দাসুবাবু যদিও ছেলেমানুষ কিন্তু কার্য্য শিখিবার জন্য গিরিশবাবু মহাশয় উহাকে সহকারী স্টেজ ম্যানেজার করেন এবং হিসাবপত্র সব ভাল থাকিবে ও বন্দোবস্ত সব সুশৃঙ্খলে হইবে বলিয়া তিনি এখনকার প্রোপ্রাইটার বাবু হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়কে আনিয়া সকল ভার দেন। হরিবাবু মহাশয় চিরদিনই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। গিরিশবাবু মহাশয় নূতন থিয়েটারের উন্নতি করিবার জন্য শিক্ষা-কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সে জন্য সুযোগ্য লোক দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের উপর এক এক কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। অতি উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা ২।৩টার সময় রিহালসালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম; এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটী বহিয়া পিট, ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি পিছু চারিকড়া করিয়া কড়ি ধার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্র পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন, আমি গুর্ম্মুখবাবু আর ২।১ জন রাত্র জাগিয়া কার্য্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে? অতি উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যয়ে থিয়েটার প্রস্তুত হইল। বোধহয় এক বৎসরের ভিতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার সহিত আমি আর একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না, থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে "এই যে থিয়েটার হাউস্ হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।" এই আনন্দে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন—তাহা জানি না! যে পর্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে "নাম" হইবে। কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজেষ্ট্রি করিয়া আসিলেন—তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহকয়েক বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল? দাসুবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে "স্টার।" এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম

"বেশ!" পরে মনে ভাবিলাম যে উঁহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন?' কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই! আমি তখন একেবারে উঁহাদের হাতের ভিতরে! আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখন কাহাকেও কোন কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ঐ ব্যবহার বরাবর মনে ছিল! আর থিয়েটার আমার বড় প্রিয়, থিয়েটারকে বড়ই আপনার মনে করিতাম, যাহাতে তাহাতে আর একটি নূতন থিয়েটার তো হইল; সেই কারণে সেই সময় তাহা চাপাও পড়িয়া যাইত। কিন্তু থিয়েটার প্রস্তুত হইবার পরও সময়ে সময়ে বড় ভাল ব্যবহার পাই নাই! আমি যাহাতে উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি তাহার জন্যও সকলে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাদের উদ্যোগ ও যত্নে আমাকে মাস দুই ঘরে বসিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর আবার গিরিশবাবুর যত্নে ও স্বত্বাধিকারীর জেদে আমায় পুনরায় যোগ দিতে হইয়াছিল। লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে প্রোপ্রাইটার "এতো বড় অন্যায়, যাহার দরুণ থিয়েটার করিলাম তাহাকে বাদ দিয়া কার্য্য করিতে হইবে? এ কখন হইবে না। তাহা সব পুড়াইয়া দিব।" সে যাহা হউক, একসঙ্গে থাকিতে হইলে ত্রুটী হইয়া থাকে, আমারও শত সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমায় বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ মাননীয় গিরিশবাবুর স্নেহাধিক্যে আমার অভিমান একটু বেশী প্রভুত্ব করিত; সেইজন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিনয় কার্য্যের উৎসাহের জন্য সকলেই প্রশংসা করিতেন, এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের ভাগই অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম স্নেহ কখন ভুলিতে পারিব না! এই থিয়েটারে কার্য্যকালীন কোন সুকার্য্য করিয়া থাকি আর না করিয়া থাকি প্রবৃত্তির দোষে বুদ্ধির বিপাকে অনেক অন্যায় করিয়াছি সত্য! কিন্তু এই কার্য্যের দরুণ অনেক ঘাত-প্রতিঘাতও সহিতে হইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ টাল-বেটালের পর নূতন "স্টারে" নূতন পুস্তক "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন সকলেরই মনোমালিন্য এক রকম দূরে গিয়াছিল। সকলেই জানিত যে এই থিয়েটারটী আমাদের নিজের। আমরা ইহাকে যেমন বাহ্যিক চাকচিক্যময় করিয়াছি তেমনিই গুণময় করিয়া ইহার

সৌন্দর্য্য আরও অধিক করিব। সেই কারণে সকলে আনন্দে, উৎসাহে একমনে অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতেন।

এখানকার প্রথম অভিনয় "দক্ষযজ্ঞ"। ইহাতে গিরিশবাবু মহাশয় "দক্ষ", অমৃত মিত্র "মহাদেব", ভুনীবাবু "দধীচি"। আমি "সতী", কাদম্বিনী "প্রসূতি" এবং অন্যান্য সুযোগ্য লোক সকল নানাবিধ অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কম্পন বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব "দক্ষযজ্ঞ" ব্যাপার! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবু "দক্ষ", অমৃত মিত্রের "মহাদেব" যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার" বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন তখন বোধ হয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধ হয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত। যাহা হউক, এই থিয়েটার হইবার পর গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের আগ্রহ উৎসাহে দিন দিন উজ্জ্বলতর উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। এই থিয়েটারেই কার্য্যকালীন নানাবিধ গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উৎসাহ পাইয়া আমার কার্য্যের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে পারিলাম। অভিনয়-কার্য্য যে রঙ্গালয়ের রঙ্গ নহে, তাহা শিক্ষা করিবার ও দীক্ষা দিবার বিষয়। অভিনয়-কার্য্য যে হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া লইয়া সে কার্য্য মন ও হৃদয় এক করিয়া লইতে হয়; তাহাতে কতকটা আপনাকে টানিয়া মিলাইয়া লইতে হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম, এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের যে কতদূর উচ্চ কার্য্য সমাধার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইলাম। সেই কারণ সতত যত্নের সহিত হৃদয়কে সংযম রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ভাবিতাম যে ইহাই আমার কার্য্য ও ইহাই আমার জীবন। আমি প্রাণপণ যত্নে মহামহিমান্বিত চরিত্র সকলের সম্মান রক্ষা করিতে হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিব। ইহার পর গিরিশবাবুর লিখিত সব উচ্চ অঙ্গের

পুস্তক অভিনয় হইতে লাগিল। মধ্যস্থানে সমাজ পীড়নে বা অন্য কারণে হউক গুর্ম্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। সেই সময় হরিবাবু, অমৃত মিত্র দাশুবাবু কিছু কিছু টাকা দিয়া ও কতক টাকা স্বর্গগত মাননীয় হরিধন দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া ও তখন এক্‌জিবিসনের সময় প্রত্যহ অভিনয় চালাইয়া সেই টাকার দ্বারা "ষ্টার থিয়েটার" নিজেরা ক্রয় করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসুও একজন প্রোপ্রাইটার হইলেন। এই সময় নানা কারণে ও অসুস্থ হইয়া গুর্ম্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন যে, "এই থিয়েটার যাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহাকেই ইহার স্বত্ব দিব, অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধেক স্বত্ব তাহার থাকিবে, নচেৎ আমি হস্তান্তর করিব না।"

সেই সময় গুর্ম্মুখবাবুর ইচ্ছায় আমারও সমান অংশ লইবার কথা উঠিল। লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে গুর্ম্মুখবাবু বলিয়াছিলেন যে ইহাতে বিনোদের অংশ না থাকিলে আমি কখন উহাদিগকে দিব না। এদিকে কিন্তু গিরিশবাবু মহাশয় তাহাতে রাজী হইলেন না, তিনি আমার মাকে বলিলেন যে "বিনোদের মা ও-সব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত ঝঞ্ঝাট বহিতে পারিবে না। আমরা আদার ব্যাপারি আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখন অন্যত্র কার্য্য করিব না; আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না! আমরা কার্য্য করিব; বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই! গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব।" গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোন মতেই রাজি হইলেন না। যেহেতু আমার মাতাঠাকুরাণীও গিরিশবাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এই রকম নানাবিধ ঘটনায় ও রটনায় বহু দিবসাবধি লোকের মনে ধারণা ছিল যে "ষ্টারে" আমার অংশ আছে! এমন কি অনেকবার লোকে আমায় স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তোমার কত অংশ?" সে যাহা হউক, এই থিয়েটার ইঁহাদের নিজের হাতে আসিবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে এক্‌জিবিসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তখনও এক্‌জিবিসন চলিতেছে, কত দেশ দেশান্তরের লোক কলিকাতায়! আমাদের উদ্যোগ, উৎসাহ, আনন্দ দেখে'কে? এই সময় আবার আমরা সব ঐক্য হইলাম। যে যাহার কার্য্য করিতে লাগিল, তাহা যেন তা'রই নিজের কার্য্য! এই সময়

সুবিখ্যাত “নল-দময়ন্তী”, “ধ্রুবচরিত্র” “শ্রীবৎস-চিন্তা” ও “প্রহ্লাদচরিত্র” নাটক প্রস্তুত হয়।

এই থিয়েটারের যতই সুনাম প্রচার হইতে লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় ততই যত্নে আমায় নানাবিধ সৎশিক্ষা দিয়া কার্য্যক্ষম করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এইবার “চৈতন্যলীলা” নাটক লিখিত হইল এবং ইহার শিক্ষাকার্য্যও আরম্ভ হইল। এই “চৈতন্যলীলা”র রিহারসালের সময় “অমৃতবাজার পত্রিকার” এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে, “আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিত-পাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।” তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম “হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।” যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই; প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম; পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে, “মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহাসঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করিতে পারি”; কিন্তু সারা দিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধহয় ব্যর্থ হয় নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুসংখ্যক সুধী-বৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় “রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী” বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম “কি দেখ মালিনী?” সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম; আমার মনে হইত “ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ” উনিই তো বলিতেছেন, আমি সব মন দিয়া

শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার! সকলই সেই কৃষ্ণ" তখন সত্যই মনে হইত যে "কেবা কার!" পরে যখনই উৎসাহ উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

"গয়াধামে হেরিলাম বিষ্ণমান,
বিষ্ণুপদে পঙ্কজে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী অশরীরি প্রাণী!"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে! আমি তো কেহই নহি! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদনা নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুর্‌গুর্ করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি ভবে একা দাও হে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায়॥" এই গানটী গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত। উন্মত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম। এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম।

একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি, সেদিন অতিশয় লোকারণ্য হইয়াছিল। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে প্রায় অধিক লোক

হইত। তবে যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশী লোক সকল আসিতেন তখন আরও রঙ্গালয় পূর্ণ হইত এবং প্রায় অনেক গুণী লোকই আসিতেন। মাননীয় ফাদার লাফোঁ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপসিনের পরেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন ; আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন যে "চল আমি একবার দেখিব।" গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন ; পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত বড় দাড়িওয়ালা সাহেব ঢিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন, "ইঁহাকে নমস্কার কর। ইনি মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ।" আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই! আমি হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন! আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, এবার তাহা হয় নাই ; কেন তাহা বলিতে পারিনা! এই চৈতন্য-লীলা অভিনয় জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণু-প্রেমিক পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার পবিত্র পদধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তি-ভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন! অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন ; "হরি গুরু, গুরু হরি", বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি", তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্ত্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার অন্তর

দিয়াছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরক সদৃশ করিয়াছি।

আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন, "আয় মা বোস", আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান! কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) "সত্যং শিবং" মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমার থিয়েটার কার্য্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব" আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযূষ পূরিত আশাময়ী বাণী—"হরি গুরু, গুরু হরি" আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি; তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে, "বল—হরি গুরু গুরু হরি।" এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই। তবে "বপ্নে" যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

ইহার পর "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" অভিনয় হয়! এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথমভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ! আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমায় একমাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদকারী; কিন্তু যখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত আকার ও নিরাকারবাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর ষড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ, সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না। সেই সকল স্থান অভিনয়কালীন মনের আগ্রহ যতদূর প্রয়োজন, আবার দেহের শক্তিও ততদূর দরকার। কেন না সেই লঘু হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর সংযোগে একভাবে মনের আবেগে মনে হইত যে আমি বুঝি এখনই পড়িয়া যাইব। আর সেই ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন "ঐ ঐ আমার

কালাচাঁদ” বলিয়া আত্মহারা! ইহা বলিতে যত সহজ, কার্য্যে যে কতদূর কঠিন ভাবিতেও ভয় হয়! এখনকার এই জড়, অপদার্থ দেহে যখন সেই সকল কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যে কেমন করিয়া আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতাম। তাই মনে হয় যে, সেই মহাপ্রভুর দয়া ব্যতীত আমার সাধ্য কি? আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই “দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলা” আর অভিনয় হয় নাই! এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন “বিবাহ বিভ্রাট” প্রস্তুত হয়। ইহাতে আমি “বিলাসিনী কারফরমার” অংশ অভিনয় করি! কি বিষম বৈষম্য! কোথায় জগতপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্য চরিত্র; আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা হিন্দু-সমাজ বিরোধী সভ্যা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা চরিত্র! আমি তো ছয় সাত মাস ধরিয়া এক সঙ্গে “চৈতন্য” ও “বিলাসিনীর” অংশ অভিনয় করিতে সাহস করি নাই। যদিও পরে অভিনয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেকদিন পরে তবে সাহস হইয়াছিল। অভিনয়কালীন কত যে বাধা বিপত্তি সহিতে হইত, এখন মনে হইলে ভাবি যে কেমন করিয়া এত কষ্ট সহিতাম। সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পড়িতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোনো স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয়-ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আর একটি পরিবর্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহার অধীন হইব না। ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জ্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড় বৎসর ছিল এবং সেই সময় আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্য্য স্থানে যাইতাম, আপনার কার্য্য সমাধা হইলে ভুনীবাবু ও গিরিশবাবু মহাশয়ের নিকট নানা দেশ-বিদেশের গল্প বা থিয়েটারের কথা সব শুনিতাম, এবং কি করিলে কোন খানে উন্নতি হইবে, কোন্ কার্য্যের কোথায় কি ত্রুটী আছে এই নানারূপ পরামর্শ হইত। পরে বাটীতে আসিলে স্নেহময়ী জননী কত যত্নে আহার দিতেন। সেই.তত রাত্রে উঠিয়া নিকটে বসিয়া আহার করাইতেন। আহারান্তে ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতাম। কিন্তু পরিশেষে নানারূপ মনভঙ্গ দ্বারা থিয়েটারে কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল।

যাঁহারা একসঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধহয়, সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমায় থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।

শেষ সীমা।

পত্র।

মহাশয়!

আপনাকে আর কত বিরক্ত করিব! এ ভাগ্যহীনার কলঙ্কিত জীবনের পাপকথা দ্বারা আপনাকে আর কত জ্বালাতন করিব! কিন্তু আপনার দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া এ পাপ জীবনের ঘটনা মহাশয়কে নিবেদন করিতে সাহস করি। সেই কারণে নিবেদন এই যে, যদি এতদিন দয়া করিয়া ধৈর্য্যদ্বারা আমার যন্ত্রণাময় কথা শুনিয়াছেন, তবে শেষটাও শুনুন!

মানুষ যদি আপনার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত, তাহা হইলে গর্ব্ব অহঙ্কার সকল পাপই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইত! কি ছিলাম, কি হইয়াছি! তখন যদি বুঝিতাম যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর দিতেও পারেন এবং নিতেও পারেন, তাহা হইলে কি মান অভিমানের খেলা লইয়া বৃথা দিন কাটাইতাম! এখন দিন গেছে, কথাই আছে, আর আছে স্মৃতির জ্বালা! পাপের অনুতাপ! কিন্তু ঈশ্বর দয়াময় তাহাও নিশ্চয়! জীব যতই অধঃপতিত হউক না কেন, তাঁর দয়াতে বঞ্চিত নহে। তিনিই দেন, তিনিই লন, ইহাও তাঁহার করুণা, ইহাতে আক্ষেপ নাই। সেই অসীম করুণাময় এই নিরাশ্রয়া পতিতা ভাগ্যহীনাকে একটী সুশীতল আশ্রয়স্থল দিয়াছেন। যেখানে বসিয়া এই দুর্ব্বিসহ বেদনাপূর্ণ বুক লইয়া একটু শান্তিতে ঘুমাইতে পাই! ইহা তাঁহারি করুণা! এখন শেষ কথাগুলি শুনুন!

আমি যে সময় থিয়েটারে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ের দু'একটী কথা বলি। আমি এত বালিকা বয়সে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া ছিলাম যে, আমি যখন "সরোজিনী"তে "সরোজিনী"র অংশ অভিনয় করিতাম, তখন এখনকার "ষ্টারে"র সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয় ঐ নাটকে "বিজয়সিংহে"র অংশ অভিনয়

করিতেন। তিনি এখনও বলেন, "সে সময় তোমার সহিত আমার বিজয়সিংহের ভূমিকা লইয়া প্রেমাভিনয় বড় লজ্জা হইত! কিন্তু অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইত যে একদিন অভিনয়কালীন "ভৈরবাচার্য্য" যখন "সরোজিনী"কে বলি দিতে যায়, সেই সময় দর্শকবৃন্দ এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে ফুটলাইট ডিঙ্গাইয়া ষ্টেজে উঠিতে উদ্যত। তাহাতে মহা গোলযোগ হইয়া ক্ষণেক অভিনয় কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ইহা তোমার মনে আছে কি?"

"বিষবৃক্ষে" আমি "কুন্দের" অংশ অভিনয় করিতাম। আমাদের মতন চঞ্চলস্বভাবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই ভীরুস্বভাবা শান্ত, শিষ্ট, এতটুকু হৃদয়মধ্যে অসীম ভালবাসা লুকাইয়া আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত হইয়া পরগৃহ প্রতিপালিতা হইয়া তাহার উপর দুর্ম্মতি বশতঃই হউক, আর অদৃষ্ট দোষেই হউক, সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ রূপে, গুণে, সহায় সম্পদে, ধনে মানে উচ্চ সেই আশ্রয়দাতাকে দান করিয়া, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত সেই বেদনা ভরা বুকখানিকে, বুকের মধ্যে লুকাইয়া সেই আশ্রয়দাতাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সশঙ্কিত মৃগশিশুর ন্যায় দিন কাটান! উপায় নাই, অবলম্বন নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, আত্মনির্ভরতাও নাই, এই ভাবে অভিনয় করিতে যে কত ধৈর্য্য প্রয়োজন, তাহা সমভাবি অভিনেত্রী ব্যতীত অনুভব করিতে পারিবেন না! এই সময় মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয় আমার সহিত "নগেন্দ্রনাথে"র অংশ অভিনয় করিতেন।

"বিষবৃক্ষে"র "কুন্দ"র অভিনয়ের পরই "সধবার একাদশী"র "কাঞ্চন"! কি স্বভাব সম্বন্ধে, কি কার্য্য সম্বন্ধে কত প্রভেদ! অভিনয়কালে আপনাকে যে কত ভাগে বিভক্ত করিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। একটী কার্য্যপূর্ণ ভাব সম্পূর্ণ করিয়া অমনি আর একটী ভাবকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার এটী স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অভিনয় ব্যতীত আমি সদাসর্ব্বক্ষণ এক এক রকম ভাবে মগ্ন থাকিতাম।

"মৃণালিনী"তে "মনোরমা"র চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন, তাহা যাঁহারা না মৃণালিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না! একসঙ্গে বালিকা, প্রেমময়ী যুবতী, পরামর্শদাত্রী মন্ত্রী, অবশেষে পরম পবিত্র চিত্র স্বামী সহমরণ অভিলাষিণী দৃঢ়চেতা সতী রমণী! যে কেহ "মনোরমা"র অংশ অভিনয় করিবে, তাহাকেই একসঙ্গে এতগুলি ভাব দর্শককে প্রদর্শন করিতে হইবে! গাম্ভীর্য্যের সহিত "পশুপতি"র সঙ্গে কথা

কহিতে কহিতে হঠাৎ বালিকামূর্ত্তি ধরিয়া "পুকুরে হাঁস দেখিগে," বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে কত অভ্যাস ও চিন্তাসাধ্য তাহা ধারণা করাই কঠিন। গাম্ভীর্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবিকল বালিকাভাব ধারণ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে দর্শকের নিকট অতি হাস্যজনক হইয়া উঠে; "ন্যাকাম" বলিয়া অভিনেত্রী উপহাসাস্পদ হন! সেই কারণে ৺বঙ্কিমবাবু মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল!"

আমার অভিনয় সম্বন্ধে কাগজে-কলমে যে বিস্তর সমালোচনা হইত, তাহা বলা বাহুল্য! সমালোচনায় অবশ্যই নিন্দা প্রশংসা উভয়ই ছিল, কিন্তু তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসার কথা কি পরিমাণে ছিল তাহা যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আমি সমালোচনা বড় দেখিতাম না! তাহার কারণ এই যে, যদি প্রশংসার কথা শুনিয়া আমার দুর্ব্বলচিত্তে অহঙ্কার আসে তবে তো আমি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইব। যাহা হউক দয়াময় ঈশ্বর ঐ স্থানটীতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমার এখন যেমন নিজেকে হীন ও জগতের ঘৃণিতা বলিয়া ধারণা আছে, তখনও তাহাই ছিল। আমি সুধিগণের দয়ার ভিখারী ছিলাম! তখনকার আমার অভিনয় সম্বন্ধে পরম পূজনীয় স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রিজ এণ্ড রায়ৎ" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার এক সপ্তাহের একখানির একটুকু লেখা আমি তুলিয়া দিতেছি—

"But last not least shall we say of Binodini? She is not only the Moon of Star company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity of reproducing them. She is certainly a Lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilasini Karforma, the girl graduate, exhibited so to say an iron grip of the queer phenomenon,

the Girl of the Period as she appears in Bengal society. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the suitable forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genius like faith can remove mountains."

ইহার ভাবার্থ এই—

স্টার থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গের মধ্যে শ্রীমতী বিনোদিনী চন্দ্রমা স্বরূপা। বলিতে কি তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা বলিয়া তিনি বহুবিধ চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৎ চরিত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং তিনি বিশিষ্টরূপ মার্জ্জিতারুচি বলিয়া, কোন অভিনেত্রীই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোহারিত্ব অনুকরণ করিতে পারেন নাই। বিগত বুধবার (৭ই অক্টোবর ইং ১৮৮৫) তিনি দুইটী বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণরূপ বিসদৃশ চরিত্রের অভিনয় করিয়া, উভয় চরিত্রের সম্যক সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষিত রমণী গ্রাজুয়েড্ বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে তিনি আধুনিক বঙ্গ সমাজের শিক্ষিতা মহিলার আদর্শরূপা, অদ্ভুত দৃশ্যের কঠোর ভাব প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আর যে চৈতন্যদেবকে ভগবান জানিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার চরিত্রাভিনয়ে ইনি যে প্রকৃতির বহুবিধ সক্ষম শক্তির উপর প্রাধান্য রাখিয়া থাকেন তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। কুমারী বিনোদিনীর পক্ষে এরূপ মহাপুরুষের চরিত্রাভিনয়ে সেই চরিত্রের সম্যক বিকাশ প্রদর্শন, একপ্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপারই বলিতে হইবে, তবে ঐশী প্রতিভা ও বিশ্বাস পর্ব্বতসদৃশ বাধাও অতিক্রম করিয়া থাকে!

(আবার কত লোক নিন্দাও করিত, যে নিন্দা অভিনয় সম্বন্ধে নহে। বলিত যে এইরূপ লোকদ্বারা এরূপ উচ্চ অঙ্গের চরিত্র অভিনয় করাই দোষ। যাহার যাহা মনের ভাব বলিত! আমাদের সময়ে যেমন প্রশংসা ছিল তেমনি কোনরূপ ত্রুটী হইলে নিন্দার জোরও তদধিক ছিল। অতি সামান্য ত্রুটী হইলে অজস্র কটু কথাদ্বারা গালাগালি দিতেন।)

আবার থিয়েটারে কার্য্যকালীন, সময়ে সময়ে কত দৈববিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার প্রমীলার চিতা-আরোহণ সময়ে পরিহিত মাথার কাপড় ও চুল একেবার জ্বলিয়া উঠে। একবার বৃটেনিয়া সাজিয়া শূন্যে তারের উপর হইতে নীচে একেবারে পড়িয়া যাই। এইরূপ দৈববিপদে যে কতবার পড়িয়াছি কত আর বলিব! অভিনয়কালীন যেমন আমার পার্টের দিকে মন থাকিত, তেমনি পোষাক-পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও যত্ন ছিল। ভূমিকা উপযোগী সাজিবার ও সাজাইবার আমার সুখ্যাতি ছিল। যখন নলদময়ন্তীর নূতন অভিনয় হয়, সেইসময় "নল"কে রং ও ড্রেস করিয়া দিবার জন্য কোন সাহেবের দোকান হইতে এক সাহেব আসিয়াছিল। যেহেতু অমৃতলাল মিত্র মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, রং ও পরচুলা অনেক টাকার আসিল। আমাকেও অনেকে বল্লেন যে "তুমিও রং করিয়া লও।" আমি বলিলাম যে আগে নল মহাশয়ের রং হউক দেখি। পরে "নলে"র রং করা দেখিয়া আমার মনঃপূত হইল না, বরং হাসি পাইল। যেন তেলচিটা তেলচিটা মনে হইতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম যে "না মহাশয় আমার ড্রেস ও রং আমি আপনি করিতেছি দেখুন!" তখন আমি পোষাক ও রং সম্পূর্ণ করিলাম, সকলে দেখিয়া বলিলেন যে এই রং বেশ হইয়াছে। সেই অবধি অমৃতবাবু যতবার "নল" সাজিতেন ততবারই আমি রং করিয়া দিতাম। অন্য কেহ রং করিয়া দিলে তাঁর পছন্দ হইত না। ইহার দরুন অন্য এক্‌ট্রেস্‌রা সময়ে সময়ে অসন্তুষ্ট হইত। আমার একদিন তাড়াতাড়ি থাকাতে বনবিহারিণী (ভুনী) নাম্নী একজন অভিনেত্রী বলিয়াছিল যে, "আসুন অমৃতবাবু, আমি রং করিয়া দিই।" অমৃতবাবু তাহার উত্তরে বলেন যে "রং ও পোষাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের হইতে উত্তম!" আমি সকল সময়েই নিজে নিজের পোষাক ও রং করিতাম, ড্রেসারেরা শুধু সংগ্রহ করিয়া দিতেন। আমি এমন সুরুচিসম্পন্নরূপে ড্রেস করিতে পারিতাম যে আমার পোষাকের কেহই প্রায় নিন্দা করিত না। আমার মাথার চুলগুলিকে যখন যেভাবে প্রয়োজন হইত সেই ভাবেই বিন্যস্ত করিতে পারিতাম। আমার চুলের কার্লিংগুলি এত সুন্দর হইত যে গিরিশবাবু মহাশয় আদর করিয়া বলিতেন যে, "একজন ইটালিয়ন কবি বলিতেন তাঁহার পুস্তকের একটী সুন্দর বালিকার মুখের এক স্থানের একটী তিলের জন্য তাঁহার জীবন দিতে পারিতেন; তোমার এই চুলের কার্লিংগুলি দেখিলে ইহার কত দাম ঠিক করিতেন বলিতে পারি না।" হইতে পারে গিরিশবাবু আমায় স্নেহ করিতেন বলিয়া খুব বেশী বলিতেন, কিন্তু আমার

ড্রেসের কেহ কখন নিন্দা করেন নাই। এক্ষণকার "স্টার থিয়েটারের" সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও আমার ড্রেস করিবার অতিশয় সুখ্যাতি করিতেন। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের নিজ নিজ পোষাকের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন। যেহেতু একজন লোককে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকল দশা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া দর্শকসমীপে উপস্থিত হইতে হয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, গম্ভীর নানারূপ মনের অবস্থা দেখাইতে হইবে, তখন একই জনকে মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গীর ভাবও নানারূপ দেখাইতে হইবে। সেইজন্য পোষাকেরও পরিবর্ত্তন চাই! কেননা "আগে দর্শন ডালি, পিছাড়ি গুণ বিচারি।"

যে সময় আমি থিয়েটারের কার্য্যে জীবিকা অতিবাহিত করিয়াছিলাম, পূর্বে বলিয়াছি তো যে সুকার্য্য কিছু করি আর না করি বুদ্ধির বিপাকে প্রবৃত্তির অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকিব। "ষ্টার থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিবার কালীন এত ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইয়াছিল যে ইহার জের থিয়েটার হইতে অবসর লওয়ার পরও শেষ হয় নাই। কোন এক রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। আমার গুর্ম্মুখ বাবুর আশ্রয় লইবার সময় আমার পূর্ব্ব আশ্রয় দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত অতিশয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম হওয়ায় আমাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। পরে সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ হইলে একদিন পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত যুবক আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, যে "বিনোদ, তুমি আমায় প্রতারণা করিয়া তোমার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইলে; কিন্তু এ তোমার ভুল! তুমি কতদিন লুকাইয়া থাকিবে? আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার শত্রুতা করিব। আমার কথার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না। তুমি ঠিক জানিও আমার কথা মিথ্যা হইবে না। মৃত্যুর পরও তোমায় দেখা দিব জানিও।" আমি তখন একথা বিশ্বাস করি নাই, বোধহয় আমার মুখে একটু অবিশ্বাসের হাসিও দেখা দিয়াছিল; কিন্তু ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন আমি ইহার সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হই। তখন আমি থিয়েটার হইতে অবসর লইয়া ঘরে বসিয়াছিলাম। উক্ত রবিবারে সবেমাত্র আমার ঘরে সন্ধ্যার আলো দিয়া গিয়াছে। আমি সেদিন আলস্য ভাবে বিছানায় সন্ধ্যার সময়ই শয়ন করিয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম না। তবে মনটা কেমন অবসন্ন ছিল, সেইজন্য সন্ধ্যার সময়ই শুইয়াছিলাম, কোন কারণ না থাকিলেও যেন দেহ মন অবসন্ন

হইয়া আসিতে ছিল। আমি অর্দ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে আমার ঘরের প্রবেশদ্বারের দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন সময় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে সেই বাবুটি মলিন ভাবে আমার ঘরের সম্মুখের দ্বার দিয়া অতি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আসিয়া আমার মাথায় দিকে খাটের ধারে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন! এবং আমায় সম্বোধন করিয়া অতি ধীর ও শান্ত ভাবে বলিলেন, যে "মেনি, আমি আসিয়াছি!" তিনি প্রায়ই আমায় "মেনি" বলিয়া ডাকিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে যখন তিনি ঘরের মধ্যে আসেন তখন আমার দৃষ্টি বরাবর তাঁর দিকেই ছিল। তিনি খাটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র আমি চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "একি! তুমি আবার কেন আসিয়াছ?" তিনি যেন কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি যাইতেছি তাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা কহিবার সময় কোনরূপ চঞ্চলতা বা অঙ্গ চালনা কিছুই ছিল না; যেন মাটীর তৈয়ারী পুতুলের মতন মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল! আমার একবার মাত্র মনে হইল যে তিনি একটু সরিয়া আমার দিকে হাত তুলিলেন। একটু ভয়ও হইল, আমি ভয়ে কিছু পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া বলিলাম, "সে কি! তুমি কোথায় যাইতেছ? আর এত দুর্ব্বল হইয়াছ কেন?" তিনি যেন আরও বিষণ্ণ ও স্থির হইয়া বলিলেন, "ভয় পাইও না আমি তোমায় কিছু বলিব না; আমি বলিয়াছিলাম যে আমি যাইবার সময় তোমায় বলিয়া যাইব, তাই বলিতে আসিয়াছি, আমি যাইতেছি!" এই কথা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সেই দরজা দিয়াই চলিয়া যাইলেন!

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, "মা উপরে কে আসিয়াছিল?" মা বলিলেন, "কে উপরে যাইবে? আমি তো এই সিঁড়ির নীচেই বসিয়া রহিয়াছি।" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ মা অমুক বাবু যে আসিয়াছিলেন!" আমার মা হাসিয়া বলিলেন, "দরজায় মিশির বসিয়া আছে, আমি সদর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি; কে আসিবে? তুই স্বপ্ন দেখ্‌লি নাকি? (মিশির আমাদের দরওয়ান) কোন ব্যক্তি বাহির হইতে আসিলে অগ্রে সে খবর দেয়।" তখন আর কিছু না বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া মনে করিতে লাগিলাম, যে কি হইল? সত্য কি স্বপ্ন দেখিলাম নাকি? তাহার পর দিবস সন্ধ্যার আমি বাটীর ভিতর বারান্দায় বসিয়া আছি, আর আমার মাতা

কি কার্য্যবশতঃ সদর দরজায় গিয়াছিলেন। এমন সময় রাস্তার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি একখানা ঠিকাগাড়ীর ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো গিন্নি! শুনিয়াছ, গত কল্য সন্ধ্যার সময় বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" সেই লোকটা মৃত ব্যক্তির একজন কর্ম্মচারী। তাহার কথা রাস্তা হইতে আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলাম সত্যই কি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি সত্যপালন করিয়া গেলেন। পূর্ব্ব দিনের স্মৃতি আসিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার শরীর যেন বরফের মত শীতল অনুভব হইতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা লিখিবার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে, মৃত্যুর পর মানুষ যে স্ব-রূপে কোন জীবিত ব্যক্তির নয়নগোচর হইতে পারে, ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু অন্য কেহ কখন যদি এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের বিশ্বাসকে আরও একটু বলবান করিবার জন্য ইহা লিখিলাম।

আর একটী ঐরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা আমার একজন আত্মীয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যদিও সে ঘটনার সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি সাদৃশ্য বোধে লিখিলাম।

আমার কনিষ্ঠা কন্যার যখন মৃত্যু হয়, সেইদিন ঠিক সেই সময়ে আমার সেই কন্যা অথবা তাহার ছলনাময়ী মূর্ত্তি সেই আত্মীয়টীর প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমিও যেমন আলস্য-জড়িত-দেহে শুইয়াছিলাম মাত্র, তিনিও সেইরূপ সুষুপ্তি হইতে অন্তরে ছিলেন। আমার কন্যা-মূর্ত্তিকে দেখিয়া বলেন, "একি! কালো! তুই এখানে?" তিনি তখন কলিকাতার বাহিরে বাহিরে বাস করিতেছিলেন। মূর্ত্তি উত্তর করিল, "হ্যাঁ!" আত্মীয় তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! এত অসুস্থ শরীরে তুই এলি কি করে মা?" ছায়াময়ী উত্তর করিল, "এলুম!" দুটী তিনটী কথা কহিয়া তিনি যেমন উঠিয়া বসিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না! নিমেষে অদৃশ্য হইল! মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম মৃত্যু! কিন্তু তাহার শেষ গতি কি তাহার মীমাংসা কে করিবে? বহু দার্শনিকের বহু প্রকার সিদ্ধান্ত! কাজেই লেখনী এখানে মূক! তবে মৃত মনুষ্য যে কথা কহিতে পারে ইহাও আশ্চর্য্য! হইতে পারে আমার ভ্রম এবং অনেকেও তাহা বলিতে পারেন। যদি কেহ কখন মৃত আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন, তবে তিনিই আমার কথা সত্য বলিয়া মানিতে পারেন! কিন্তু আত্মা যদি অবিনাশী হয় এবং ইচ্ছাশক্তিতে যদি দেহের গঠন হয় তবে এইগুলি বোধ হয় অবিশ্বাস্য নয়।

আমার এই ক্ষুদ্র কথার ভিতর ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে লিখিবার অন্ত উদ্দেশ্য নাই ; তবে, যে ষ্টার থিয়েটার স্বদেশে, বিদেশে, সুযশে, সুনামে পরিপূর্ণ ছিল— আমি এক্ষণে সে ষ্টার থিয়েটার হইতে বহু দূরে ; হয় তো আমার স্মৃতি পর্য্যন্ত এক্ষণে তাহার নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেননা সে বহু দিনের কথা। চিরদিন কখন সমান যায় না! আজ জগৎ জোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে "ষ্টার থিয়েটারে"র নাম উন্নত বক্ষে অবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয়া বলিয়া মনে করিত! এক্ষণে শত আরাধনায় যাহাদের একবারমাত্র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয় তো কোন্ আঁধারের কোণে কাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত! তাই বলি চিরদিন কখন সমান যায় না! লোকে দিন পায়, আবার সেদিনও চলিয়া যাইতে পারে! হৃদয় শোকে তাপে বিজড়িত হইলে, যাতনায় অস্থির হইলে, যাহাদের আপনার মনে করা যায় বা যাহারা এক সময় অতিশয় আত্মীয়তা জানাইয়াছিল, তাহাদের নিকট সহানুভূতি পাইতে আশা করে, তাই আপনা হইতে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে আসে! সেজন্য পূর্ব্ব কথা তুলিলাম। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। আর আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণা স্ত্রীলোকের এক্ষণকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কোন অতিরঞ্জিত কথা বলিবার সাহস কেন হইবে, আর আমি গর্ব্ব করিয়াও কোন কথা বলি নাই! যে স্বার্থ আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহার জন্য অপরে বাধ্য নহে। শুদ্ধ বুদ্ধিহীনা স্ত্রীস্বভাবের দুর্ব্বলতা বশতঃ একথা উঠিল, নচেৎ এ ক্ষুদ্র কথা উল্লেখ যোগ্যও নহে এবং ইহা বহুদিনের কথা বলিয়া হয় তো কোন কোনটা গোলও হইতে পারে, ইহার জন্য এখন যাঁহারা আমার সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়াছেন তাঁহারা না বিরূপ হয়েন। বহুদিনের ঘটনা মনে করিয়া লিখিতে গেলে হয় তো তাহার দু' একটী গোলও হইতে পারে।

এই ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে জীবনের প্রথম উদ্ভাসিত অবস্থায় দিন কাটিয়া গিয়াছিল। বাহ্যিক অবস্থা তো বড়ই ঘৃণিত, পতিত। কিন্তু যাঁহারা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখে ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ পুস্তক পাঠ না করেন। কেন না রমণী জীবনে যাহা প্রধান ক্ষত স্থান তাহাতে লবণ দিয়া নাই বিরক্ত করিলেন। যাঁহারা দুঃখিনী হতভাগিনী বলিয়া একটুখানি দয়া করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন তাঁহারা যেন এ হৃদয়ের মর্ম্ম ব্যথা বুঝেন। এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্ম্মভেদী যাতনার বোঝা হৃদি-

মুখে চাপা, কত নিরাশা হা-হুতাশ, দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে—তাহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে; কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী-হৃদয় লইয়া সংসারে আসে। যে রমণী স্নেহময়ী জননী, তাহারাও সেই রমণীর জাতি! যে রমণী জলন্ত অনলে পতি সনে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী-জাতি। তবে গোড়া হইতে পাষাণে পড়িয়া আছাড়্ পিছাড়্ খাইতে খাইতে একেবারে চুম্বক ঘর্ষিত লৌহ যেরূপ চুম্বক হয়, আমরাও সেইরূপ পাষাণে ঘর্ষিত হইয়া পাষাণ হইয়া যাই! আরও একটী কথা বলি, সকলেই সমান নহে; যে জীবন অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহা এক রকম নির্জীব ভাবে জড় পদার্থের মত চলিয়া যায়। কিন্তু যে জীবন দূরে দূরে উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করিতেছে অথচ পতিত হইয়া আত্মীয়, সমাজ, স্বজন-বন্ধন হইতে বঞ্চিত তাহাদের জীবন যে কতদূর কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন্ কি? যাঁহারা লোকালয়ে ঘৃণা দেখাইয়া লোক চক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা করিয়া বিশ্বাসবতী অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইয়া আত্ম-সমর্পণকারী রমণী হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছুই দোষী নহেন! দোষ কাহাদের? যে সকল হতভাগিনীরা সুধাবোধে বিষপান করিয়া চিরজীবন জর্জ্জরিত হইয়া হৃদয়-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তাহাদের কি? যে ভাগ্যহীনা রমণীরা এইরূপে প্রতারিতা হইয়া আপনাদের জীবনকে চির শ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে

যে বারাঙ্গনা জীবন কত যন্ত্রণাদায়ক! যাতনার তীব্রতা তাহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। আবার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য ঐ অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন! যেমন ভাগ্যহীনা-দের সর্বনাশ করিয়াছেন, তাহারা যদি তাহাদের সুকুমারমতি-বালক-বালিকাদের সৎপথে রাখিবার জন্য কোন বিদ্যালয়ে বা কোন কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে, তখন ঐ সমাজপতিরাই শত চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সেই স্থান হইতে দূর করিতে যত্নবান হন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞতার প্রভাবে অভাগা বালক বালিকারাও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পাপ পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়া বিষ-দৃষ্টির দ্বারা জগতের দিকে চাহিয়া থাকে। সুকুমারমতি-বালিকাদের পবিত্র সরলতা হৃদয় হইতে যাইতে না যাইতে, তাহাদের হৃদয়ে মধুরতা সমাপ্ত হইতে না হইতে, তাহাদের কচি হৃদয়খানি অবিশ্বাস অনাদরের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে। এমন পুরুষপ্রবর অনেকে আছেন, যে নিজের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আত্মদমনে অক্ষম হইয়া, একজন অবলার চিরজীবনের শান্তি নষ্ট করিয়া—সমাজে ঘৃণিত, স্বজনে বঞ্চিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিয়া পৌরুষ জ্ঞান করেন। হায়! ভাগ্যহীনা রমণী, কি ভুল করিয়াই আত্মবিনাশ কর! পঙ্কে যে পদ্ম ফুল ফুটে তাহা দেবতা মস্তক পাতিয়া লন; কেননা তিনি ঈশ্বর! আর মানুষেরা সুকুমারমতি বালিকাগণকে লতা হইতে বিচ্যুত করিয়া পদে দলিত করেন, কেননা ইহারা মানুষ! যাক্। যে ভুল সারাজীবনকে বিষময় করে, তাহা যে কি ভয়ানক ভুল, তাহা এই ভাগ্যহীনারাই বুঝে! শত দোষ করিলে পুরুষের ক্ষতি নাই; কিন্তু "নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।"

এক্ষণে নানাকারণ বশতঃ থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবন নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতেছিলাম। এই নানা কারণের প্রধান কারণ যে আমায় অনেক রূপে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আমার সহিত যে সকল ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। থিয়েটার বড় ভালবাসিতাম তাই কার্য্য করিতাম। কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম। এই দুঃখময় জীবনের একটী সুখের অবলম্বন পাইয়াছিলাম। একটী নির্ম্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া এ কলঙ্কিত জীবনকে শান্তিদান করিতেছিল। কিন্তু এই দুঃখিনীর কর্ম্মফলে তাহা সহিল না! আমার শাস্তির চরমসীমায় উপস্থিত করিবার জন্য সেই অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পারিজাতটী আমার চিরদুঃখিনী করিয়া এই নৈরাশ্যময় জীবনকে জ্বালার

জলন্ত পাবকে ফেলিয়া স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সে আমার বড় আশা ও আদরের ধন ছিল। তাহার সরল পবিত্র চক্ষু দুটীতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িত! সেই স্নেহময় নির্ভর পরায়ণা হৃদয়টীতে দেবীর পবিত্রতা, ফুলের অসীম সৌন্দর্য্যরাশি, জাহ্নবীর পবিত্র কুল কুল ধ্বনি, বিকশিত পদ্মের ন্যায়, মধুময় হৃদয়ের পবিত্রতা রাশি সদাই উথলিয়া আমার জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিত। তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা-রহিত নির্ম্মলতা কত উচ্চে আমাকে আকর্ষণ করিত। এ দেবতার দয়ার দান, অভাগিনীর ভাগ্য দোষে দেবতার দান সহিল না। আমার সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া আমার অন্ধকার হৃদয়ে বিষময় বাতি জ্বালিয়া দিয়া সে আমার চলিয়া গিয়াছে! এখন আমি একা পৃথিবীতে, আমার আর কেহই নাই, সুধুই আমি একা! এখন আমার জীবন শূন্য মধুময়! আমার আত্মীয় নাই স্বজন নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, কার্য্য নাই, কারণ নাই! এই শেষ জীবনে ভগ্নহৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশা, উদ্যম, ভরসা, উৎসাহ, প্রাণময়ী সুখময়ী কল্পনা, সকলই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! অহরহঃ সুধু যন্ত্রণার তীব্র দংশন! এই আমি—অসীম সংসার প্রান্তরে একটী সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছাওয়ায় বসিয়া কতক্ষণে চির শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই সুবিশাল সুশীতল তরুই আমার এই জীবন্মৃত অবস্থার আশ্রয় স্থান! আমার অন্তর ব্যথা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আমি ইহা লিখিলাম। কেননা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আর আমার ভয় নাই। লোকই সে ভয় দূর করিয়াছে। তাঁহাদের নিন্দা বা সুখ্যাতি আমার নিকট সকলই সমান! গুণী, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লিখেন লোকশিক্ষার জন্য, পরোপকারের জন্য, আমি লিখিলাম, আমার নিজের সান্ত্বনার জন্য, হয়তো প্রতারণা বিমুগ্ধ নরক পথে পদবিক্ষেপোদ্যতা কোন অভাগিনীর জন্য। কেননা আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিতা, সমাজবর্জ্জিতা, বারবণিতা; আমার মনের কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই! তাই কালি-কলমে লিখিয়া আপনাকে জানাইলাম। আমার কলুষিত কলঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় এই নির্ম্মল সাদা কাগজকেও কলঙ্কিত করিলাম। কি করিব! কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ব্যতীত আর কি আছে?

প্রথম খণ্ডের শেষের দুটী কথা

এতদিনে আমার কর্ম্মতরু সম্পূর্ণরূপে ফলফুলে পূর্ণ হইয়া আমার অদৃষ্টাকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছাইয়া উঠিল। এইবার সব ঠিক্!

কারণ কি তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। অনেক দিবস হইল ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমার নাট্যজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি; তিনি ইহার প্রতি ছত্র, প্রতি লাইন দেখিয়া শুনিয়া দেন; তিনি দেখিয়া ও বলিয়া দিতেন মাত্র, কিন্তু একছত্র কখন লিখিয়া দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে আমি সরলভাবে সাদা ভাষায় যাহা লিখি তাঁহার নিকট সেই সকল বড় ভালই বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে আমার জীবনী লিখিয়া **আমার কথা** নাম দিয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করি। তিনিও এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে রোগ যাতনা ভোগ করিবার জন্য ও নানা ঝঞ্চাটে কতদিন চলিয়া যায়। পরে তাঁহার পরিচিত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছাপাইবার জন্য কল্পনা করেন। কিন্তু আমার কতক অসুবিধা বশতঃ হ্যাঁ—না, এইরূপ নানা কারণে তখন হয় নাই। তাহার পর আমি মরণাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া চারি মাস শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকি; আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না; শত শত সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাবিধ চিকিৎসা শুশ্রূষা, দৈবকার্য্য করিয়া, প্রায় অনাহারে, অনিদ্রায় বহু অর্থ ব্যয়ে দেবতাস্বরূপ আমার আশ্রয়দাতা দয়াময় মহামহিমান্বিত মহাশয় আমায় মৃত্যুমুখ হইতে কাড়িয়া লইলেন। ডাক্তার, সন্ন্যাসী, ফকির, মোহন্ত, দৈবজ্ঞ, বন্ধু বান্ধব সকলে একবাক্যে বলিয়াছিলেন, যে "মহাশয় সুধু আপনার ইচ্ছার জোরে (Will force) ইনি জীবন পাইলেন।" সেই দয়াময় তাঁহার ধন সম্পত্তি, তাঁহার মহজ্জীবন একদিকে; আর এই ক্ষুদ্র পাপিয়সীর কলঙ্কিত জীবন একদিকে করিয়া দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন। আমি ব্যাধির যাতনায় বিগত নাড়ী হইয়া জ্ঞান হারাইলে, তিনি আমার মস্তকে হাত রাখিয়া স্নেহময় চক্ষুদুটী আমার চক্ষের উপর রাখিয়া, দৃঢ়ভাবে বলিতেন, "শুন, আমার দিকে চাহ; অমন করিতেছ কেন? তোমার কি বড় যাতনা হইতেছে? তুমি অবসন্ন হইও না! আমি জীবিত থাকিতে তোমায় কখনও মরিতে দিব না। যদি তোমার আয়ু না থাকে তবে দেবতা সাক্ষী, ব্রাহ্মণ সাক্ষী, তোমার এই মৃত্যুতুল্য দেহ সাক্ষী, আমার অর্দ্ধেক পরমায়ু তোমায় দান করিতেছি, তুমি সুস্থ হও! আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি কখনই মরিতে পাইবে না।"

সেই সময় তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অমৃতময় স্নেহপূর্ণ জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আমার রোগক্লিষ্ট যাতনাময় দেহ অমৃতধারায় স্নাত করাইয়া শীতল করিয়া দিত। সমস্ত রোগ-যাতনা দূরে চলিয়া যাইত। তাঁহার স্নেহময় হস্ত আমার মস্তকের উপর যতক্ষণ থাকিত আমার রোগের সকল যাতনা দূরে যাইত।

এইরূপ প্রায় দুই তিনবার হইয়াছিল; দুই তিনবারই তাঁহারই হৃদয়ের দৃঢ়তায় মৃত্যু আমায় লইতে পারে নাই। এমন কি শুনিয়াছি অক্সিজেন গ্যাস দিয়া আমায় ১২।১৩ দিন রাখিয়া ছিল। যাঁহারা সে সময় আমার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা এখনও সকলে বর্ত্তমান আছেন। সেই সময় মাননীয় বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়, উপেনবাবু, কাশীবাবু প্রভৃতি প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া আমায় যত্ন করিতেন: সকলেই এ কথা জানিত।

বুঝি এইরূপ সুস্থদেহে অসীম যাতনার বোঝা বহিতে হইবে বলিয়া, অতি হৃদয়শূন্য ভাবে লোকের নিকট উপেক্ষিত হইতে হইবে বলিয়া, অবস্থার বিপাকে এইরূপ দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইবে বলিয়া, অসহায় অবস্থায় এইরূপ অসীম যাতনার বোঝা বুকে করিয়া সংসার সাগরে ভাসিতে হইবে বলিয়া, আমার দুরদৃষ্ট তাঁহার বাসনার সহিত যোগ দিয়াছিল! বোধহয় তাহাতেই সেই সময় আমার মৃত্যু হয় নাই। অথবা ঈশ্বর তাঁহার পরম ভক্তের বাক্যের ও কামনার সাফল্যের জন্যই আমায় মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া দিলেন! কেননা আমার হৃদয়-দেবতা তিলেকে শতবার বলিতেন, যে "সংসারের কাজ করি সংসারের জন্য; শান্তি তো পাইনা; তাই বলিতেছি যে তুমি আমার আগে কখন মরিতে পাইবে না।" আমি যখন তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরে বলিতাম, "এখন আর ও সকল কথা তুমি আমায় বলিও না। ত্রিসংসারে এ হতভাগিনীর তুমি বই আশ্রয় নাই। এ কলঙ্কিনীকে যখন সংসার হইতে তুলে আনিয়া চরণে আশ্রয় দিয়াছিলে তখন তাহার সকলই ছিল! মাতামহী, মাতা, জীবন জুড়ান কন্যা, রঙ্গভূমের সুখসৌভাগ্য, সুযশ, আশাতীত সম্পদ, বঙ্গ রঙ্গভূমের সমসাময়িক বন্ধুগণের অপরিসীম স্নেহমমতা সকলই ছিল, তোমারই জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি; তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ফেলে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব।" তিনি হাসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, যে "সেজন্য ভেবনা, আমার অভাব ব্যতীত তোমার অন্য কোন অভাবই থাকিবে না। এমন বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই যে এতদিন তোমায় এত আদরে, এত যত্নে আশ্রয় দিয়া, তোমার এই রুগ্ন অসমর্থ অবস্থায় তোমায় জীবনের দারুণ অভাবের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইব। তাহার প্রমাণ

দেখ যে আমায় আত্মীয়দিগের সহিত একভাবে তোমায় আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। এত জেনে শুনে যে তোমায় বঞ্চিত করিবে— আমার অভিশাপে সে উৎসন্ন যাইবে!”

তাঁহার মত সহৃদয় দয়াময় যাহা বলিবার তাহা বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে আমার অদৃষ্ট, তীক্ষ্ণ অসি হস্তে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার জীবনভরা সমস্ত আশাকে ছেদন করিতেছে! আজ তিন মাস হইল এই অসহায়া অভাগিনী কাহারও নিকট হইতে তিন দিনের সহানুভূতি পাইল না; অভাগিনীর ভাগ্য! দোষ কাহারও নয়—কপাল! প্রাক্তনের ফল!! পাপিনীর পাপের শাস্তি!!!

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বৎসরাধিক উত্থানশক্তিহীন হইয়া জড়বৎ ছিলাম। পরে আমায় চিকিৎসকদিগের মতানুযায়ী বহুস্থানে, বহু জল-বায়ু পরিবর্ত্তন করাইয়া, হৃদয়দেবতা আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে দান করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ নানা অসুবিধায় এই পুস্তক তখন ছাপান হইল না। ৺গিরিশবাবুও দারুণ ব্যাধিতে স্বর্গে গমন করিলেন। তিনিও আমায় বলিয়াছিলেন, যে “বিনোদ! তুমি আমার নিজের হাতের প্রস্তুত, সজীব প্রতিমা! তোমার জীবন-চরিতের ভূমিকা আমি স্বহস্তে লিখিয়া তবে মরিব”; কিন্তু একটা কথা আছে, যে “মানুষ গড়ে, আর বিধাতা ভাঙ্গে”, (“Man proposes but God disposes”) আমার ভাগ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

পরে ভাবিলাম যে যাহা হয় হইবে; বই হউক আর নাই হউক, আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা বড়ই ছিল যে আমি আমার অমৃতময় আশ্রয়-তরুর সুশীতল সুধামাখা শান্তি ছাওয়াটুকু এই বেদনাময় ব্যথিত বুকের উপর প্রলেপ দিয়া চির নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িব; ঐ নিঃস্বার্থ স্নেহ ধারার আচরণে আমার কলঙ্কিত জীবনকে আবরিত রাখিয়া চলিয়া যাইব। ওমা! কথায় আছে কিনা? যে “আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।” একটী লোক একবার তাহার অদৃষ্টের কথা গল্প করেছিল, এখন আমার তাহা মনে পড়িল। গল্পটী এই :—

উপযুক্ত লেখাপড়া জানা একটী লোক স্বদেশে অনেক চেষ্টায় কোন চাকুরী না পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিল। একদিন তাহার একটী বন্ধু বলিলেন, যে “বন্ধো! এখানে তো কোন সুবিধা করিতে পারিতেছ না, তবে ভাই একবার বিদেশে চেষ্টা দেখনা।” তিনি অনেক কষ্টে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রেঙ্গুন

চলিয়া গেলেন। সেখানেও কয়েক দিন বিধিমতে চেষ্টা করিয়া কিছু উপায় করিতে না পারিয়া, একদিন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া এক মাঠের উপর বৃক্ষতলায় বসিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে রৌদ্রের উত্তপ্ত বাতাসের সহিত পশ্চাৎ দিকে কে যেন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতেছে। সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?" উত্তর পাইলেন, "তোমার অদৃষ্ট"। তিনি বলিলেন, "বেশ বাপু! তুমিও জাহাজ ভাড়া করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছ? তবে চল, দেশে ফিরিতেছি, সেইখানেই আমায় লইয়া দড়িতে জড়াইয়া লাট্টু খেলিও।"

আমিও একদিন চমকিত হইয়া দেখি যে আমার অদৃষ্টের তাড়নায়, আমার আশ্রয় স্বরূপ সুধামাখা শান্তি-তরু, মহাকালের প্রবল ঝড়ে কাল-সমুদ্রের অতল জলের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যাইল। আমার সম্পূর্ণ ঘোর ছাড়িতে না ছাড়িতে দেখি যে আমি এক মহাশ্মশানের তপ্ত চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি। আবহকাল হইতে যে সকল হৃদয় অসীম যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া চিতার ছাইয়ে পরিণত হইয়াছে, তাহারাই আমার চারিধার ঘেরিয়া আমার বুকের বেদনাটাকে সহানুভূতি জানাইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "দেখ, কি করিবে বল? উপায় নাই! বিধাতা দয়া করে না, বা দয়া করিতে পারে না। দেখ, আমরাও জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, তবুও যায় নাই গো! সে সব জ্বালা যায় নাই! শ্মশানের চিতা ভস্মে পরিণত হয়েও সে স্মৃতির জ্বালা যায় নাই! কি করিবে? উপায় নাই!"

তবে যদি কোন দয়াময় দেবতা, মানুষ হইয়া বা বৃক্ষরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন, তাঁহারা কখন তোমার মত হতভাগিনীকে শান্তি-সুধা দানে সান্ত্বনা দিতে পারেন। তাঁরা দেবতা কি না? পৃথিবীর লোকের কথার ধার ধারেন না। আর কুটিল লোকের কথায় তাঁহাদের কিছু আসে যায় না! সূর্য্যের আলোক যেমন দেব-মন্দির ও আঁস্তাকুড় সমভাবেই আলোকিত করে—ফুলের সৌরভ যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সমভাবে গন্ধ বিতরণ করে—ইহারাও তেমনি সংসারের হিংসুক, নিন্দাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর লোকদিগের নিন্দা বা সুখ্যাতির দিকে ফিরেও চাহেন না।

তাঁহারা দেবলোক হইতে অপরিসীম স্নেহপূর্ণ সুধামাখা আত্মানন্দময় হৃদয় লইয়া মর্ত্ত্যভূমে দুঃখীর প্রতি দয়া করিবার জন্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মহানুভবতা দেখাইবার কারণ, বন্ধুর প্রতি সমভাবে সহানুভূতি করিবার ইচ্ছায়, সন্তানের

প্রতি পরিপূর্ণ বাৎসল্য স্নেহ প্রদানে লালন পালন করিতে, পত্নীর প্রতি সতত প্রিয়ভাবে প্রেমদানে তুষ্ট করিতে, আজ্ঞাকারীর ন্যায় সকল অভাবপূর্ণ করিবার জন্য সতত প্রস্তুত! প্রেমময়ীর নিকট অকাতরে প্রেমময় হৃদয়খানি বলি দিতে —ভালবাসার আকাঙ্ক্ষিতাকে আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসিতে—আশ্রিতকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিতে—পাত্রাপাত্র অভেদ জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষিতের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য অযাচিতভাবে লুকাইয়া দান করিতে (কত সঙ্কুচিত হ'য়ে, যদি কেহ লজ্জা পায়)—ভগবানে অটল ভক্তি রাখিবার বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে—আত্মসুখ ভুলিয়া দেবসেবা ব্রতে সুখী হইতে—প্রাণ ভরিয়া অক্লান্ত হৃদয়ে পরোপকার করিতে আইসেন। ওগো তোমাকে আর কতই বা বলিব! তাঁহাদের তুলনা সুধু তাঁহারাই—যাহা লইয়া দেবলোকে দেবতা গঠিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেখানকার সেই সকলই লইয়া এই যন্ত্রণাময় মরজগতে অতি দুঃখীকে দয়া করিতে আইসেন। সংসারের গতিকে ক্রূর হৃদয়ের বিষদৃষ্টিতে যখন সেই মানবরূপ দেবতা বা তরুবর অবসন্ন হইয়া পড়েন, তখনই চলিয়া যান। যে অভাগা ও অভাগিনীরা সেই পবিত্র ছাওয়ার কোলে আশ্রয় পাইয়া চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়ে, সংসারের যাতনাময় কোলাহলে আর না জাগিয়া উঠে, তাহারাই হয় তো সেই দেবহৃদয়ের পবিত্রতার স্পর্শে শান্তিধামে যাইতে পারে; আবার যাহারা অদৃষ্টের দোষে সেই শান্তি সুধাময় তরুচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হয়; তাহারাই এই তোমার মত যাতনায় পোড়া শ্মশানের চিতাভস্মের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। তোমার মত দুর্ভাগিনীদের আর উপায় নাই গো! যাহারা অমূল্য রত্ন পাইয়াও হারাইয়া ফেলে, তাদের উপায় নাই। আর তোমাদের মত পাপিনীদের হৃদয় বড় কঠিন হয় ও হৃদয় শীঘ্র পুড়েও না, ভাঙ্গেও না, এত জ্বালায় লোহাও গলিয়া যায়। তোমার মত হতভাগিনী বুঝি আমাদের মধ্যেও নাই, ও রকম কঠিন পাষাণ হৃদয়ের কোন উপায় নাই; তা কি করিবে বল? এই সকল কথা বলিয়া সেই জ্বালা যন্ত্রণায় পোড়া হৃদয়ের চিতাভস্মগুলি হায়! হায়! করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই ভস্ম হইতে হায়! হায়! শব্দ শুনিয়া আমার তখন খানিকটা চৈতন্য হইল। মনের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাতের মত আঘাত লাগিল, মনে পড়িল যে আমিও তো ঐরূপ একটী সুধাময় তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম। তবে বুঝি সে তরুবরটী ঐ রকম দেবতাদের জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত "দেবতরু!" ঐ চিতাভস্মগুলি যে সকল গুণের কথা বলিলেন, তাহা অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে সেই দেবতার হৃদয়

পরিপূর্ণ ছিল। দয়ার সাগর, সরলতার আধার, আনন্দের উচ্ছাসপূর্ণ ছবি, আত্মপরে সমভাবে প্রিয়বাদিতা, সতত হাস্যময়, প্রেমের সাগর, আপনাতে আপনি বিভোর, কনকোজ্জ্বল বরণ সুন্দর, রূপে মনোহর, বিনয় নম্রতা বিভূষিত, সুধামাখা তরুবর! শুনিয়াছিলাম যে দেবতারাই সময়ে সময়ে দয়া করিতে বৃক্ষ বা মানবরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র, গুহক চণ্ডালকে মিতে ব'লে স্নেহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেয়েছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও যবন হরিদাসকে দয়া করিয়াছিলেন। দুঃখী অনাথকে দয়া করিতে কি দোষ আছে? কাঙ্গালকে আশ্রয় দিলে কি পাপ হয় গা? লৌহের স্পর্শে কি পরশ পাথর মলিন হয়? না কয়লার সংস্রবে হীরকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে?

স্বর্গের চাঁদ যে পৃথিবীর কলঙ্কের বোঝা বুকে করিয়া সংসারকে সুশীতল আলোক বিতরণে সুখী করিতেছেন, পৃথিবীর লোক তাহারই আলোকে উৎফুল্ল হইয়া "ঐ কলঙ্কি চাঁদ ঐ কলঙ্কি চাঁদ" বলিয়া যতই উপহাস করিতেছে, তিনি ততই রজত ধারায় পৃথিবীতে কিরণ-সুধা ঢালিয়া দিতেছেন; আর স্বর্গের উপর বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন।

আমিও তো তবে ঐ দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় পাইয়াছিলাম! কৈ সেই আমার আশ্রয়স্বরূপ দেবতা? কৈ—কোথায়? আমার হৃদয়-মরুভূমির শান্তি প্রস্রবণ কোথায়? হু হু করিয়া শ্মশানের চিতাভস্মমাখা বাতাস উত্তর করিল, "আঃ পোড়া কপালি, এখনও বুঝি চৈতন্য হয় নাই? ঐ শুন চৈত্র মাসের ৺বাসন্তী পূজার নবমীর দিনে, মহাপুণ্যময় শ্রীরাম নবমীর শুভতিথির প্রভাতকালে ৭টার সময় সূর্য্যদেব অরুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ধরায় নামিলেন কেন, তাহা বুঝি দেখিতেছ না? পবিত্র ভাগীরথী আনন্দে উথলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সাগর উদ্দেশে কেন ছুটিতেছে, তাহাও বুঝি দেখিতেছ না? ৺জীউ; গোপাল-মন্দির হইতে ঐ যে পূজারি মহাশয় ৺জীউর মঙ্গল-আরতি সমাধা করিয়া প্রসাদি পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ঐ কাহাকে মঙ্গল-আরতি করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, চারিদিকে এত হরিসঙ্কীর্ত্তন, হরিনামধ্বনি, এত ব্রহ্মনামধ্বনি কেন গা? একি? সুরধুনির তীরে দেবতারা আসিয়াছেন নাকি? প্রভাতী-পুষ্পের সৌরভ বহিয়া বায়ু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? দেবমন্দিরে এত শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি কেন? কিরণছটা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যদেব কাহার জন্য স্বর্গ হইতে রথ লইয়া আসিয়াছেন? তাহাও কি বুঝিতেছ না?"

চমকিত হইয়া দেখি, ওমা! আমারই আজ ৩১ বৎসরের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইল! এই দীনহীনা দুঃখী প্রাণী আজ ৩১ বৎসরের যে রাজ্যেশ্বরীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল, মহাকালের ফুৎকারে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা কালসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল! অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মস্তকে প্রস্তরের আঘাত পাইলাম, শত সহস্র জোনাকি-বৃক্ষ যেন চক্ষের উপর দিয়া ঝক্‌মকিয়া চলিয়া গেল!

আবার যখন চৈতন্য হইল, তখন মনে পড়িল যে আমি "আমার কথা" বলিয়া কতকগুলি মাথামুণ্ড কি লিখিয়াছিলাম। তাহার শেষেতে এই লিখিয়া-ছিলাম যে "আমি মৃত্যুমুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। মৃত্যুর জন্য তো লোকে আশা করিয়া থাকে, সেও তো জুড়াবার শেষের আশা!"

ওগো! আমার আর শেষও নাই, আরম্ভও নাই গো! ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের ১৪ই বুধবারের প্রাতঃকালে সে আশাটুকু গেল!

মরিবার সময় যে শান্তিটুকু পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহাও গেল, আর তো একেবারে মৃত্যু হবে না গো, হবে না! এখন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর যাতনাটি বুকে করিয়া চিতাভস্মের হায়-হায় ধ্বনি শুনিতেছি। আর দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া এই মহাপাতকিনীর কর্ম্মফলরূপ সুবিশাল শাখা প্রশাখা ফুল ও ফলে পূর্ণ তরুতলে বসিয়া আছি গো!

পৃথিবীর ভাগ্যবান লোকেরা শুন, শুনিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইও। আর ওগো অনাথিনীর আশ্রয়তরু, স্বর্গের দেবতা, তুমিও শুন গো শুন! দেবতাই হোক্, আর মানুষই হোক্, মুখে যাহা বলা যায় কার্য্যে করা বড়ই দুষ্কর! ভালবাসায় ভাগ্য ফেরে না গো, ভাগ্য ফেরে না!! ঐ দেখ চিতাভস্মগুলি দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, আর হায়-হায় করিতেছে।

এই আমার পরিচয়। এখন আমি আমার ভাগ্য লইয়া শ্মশানের যাতনাময় চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি! এখন যেমন অযাত্রার জিনিস দেখিলে কেহ রাম, রাম, কেহ শিব, শিব, কেহবা দুর্গা, দুর্গা বলেন, আবার কেহ মুখ ঘুরাইয়া লইয়া হরি, হরি বলিয়া পবিত্র হয়েন। যাঁহার যে দেবতা আশ্রয়, তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই মহাপাতকীর পাপ কথাকে বিস্মৃত হউন। ভাগ্যহীনা, পতিতা কাঙ্গালিনীর এই নিবেদন। ইতি—১১ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল, বুধবার।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ক *

আমার অভিনেত্রী জীবন

জীবনের পথে ঘুরতে ঘুরতে,—সংসারের অতিথশালা থেকে যখন বিদায় নেবার সময় এসেছে, মরণের সিন্ধু-কূল থেকে আমার জীর্ণশীর্ণ দেহখানিকে টেনে এনে, আমার সেই কতদিনের পুরাণ স্মৃতিকে ঘ'সে মেজে জাগিয়ে তোলার আবার চেষ্টা করছি কেন? এ কেন'র উত্তর নেই। উত্তর খুঁজে পাই না। তবে একটা কথা আমার মনে হয়। মনে হয়, বালিকা ও কৈশোরে আমার শাদা মনের উপর প্রথমে লাল রঙের ছোপ পড়ে, বহু বর্ষের বহু-বর্ণ-বিপর্য্যয়েও সে আদিম লালের আভা আজও আমার কুয়াসাচ্ছন্ন মন থেকে একেবারে মিলিয়ে যায়নি। কালের যবনিকা ভেদ ক'রে এখনও সে রঙ্‌ মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে। কোন কিছু বলতে গেলে তাই আগে মনে পড়ে সেই কথা, যা আমার কাছে এখনো সুখ-স্বপ্নের মত মধুর, যার মাদকতার আবেশ ও আবেগ এখনও আমি ভুলতে পারিনি—আর যা বোধহয় আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী হয়েই থাকবে। তাই বোধ হয় আমার এই অভিনেত্রী জীবনের কথা বলবার সাধ।

সাধ তো! কিন্তু ক্ষমতা আমার কতটুকু? আর বলবোই বা কি?

---

* ১৩৩১ সালে বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামে ধারাবাহিকভাবে নিজের স্মৃতিকথা লেখেন। অবশ্য পত্রিকায় মোট ১১টি কিস্তিতে (১২শ সংখ্যা, ৪ঠা মাঘ ১৩৩১ থেকে ২৮শ সংখ্যা, ২৬শে বৈশাখ ১৩৩২ পর্যন্ত) ঐ লেখাটি প্রকাশিত হলেও অজ্ঞাত কারণে বিনোদিনী লেখা বন্ধ করেন। তখন বিনোদিনীর বয়স ৬২ বছর, অর্থাৎ তাঁর রঙ্গালয় ত্যাগের পর দীর্ঘ ৩৮ বছর পার হয়ে গেছে। এর আগে তিনি যে 'আমার কথা' প্রকাশ করেছেন তারও এক যুগ উত্তীর্ণ। দীর্ঘদিন পরে স্মৃতি থেকে নিজের পুরনো জীবনের কথাগুলিকে তিনি এখানে লিখেছেন। খুঁটিনাটি অনেক তথ্যে ভ্রান্তি ঘটেছে, সব কথা স্মরণ নাই; আবার নতুন অনেক বোধ ও পরিণত উপলব্ধিতে এ-রচনা সমুজ্জ্বল। এই অসমাপ্ত স্মৃতিচারণায় বিনোদিনীর গদ্যরীতির বিস্ময়কর পরিবর্তনও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্পাদক।

কোন্ কথা রেখেই বা কোন্ কথা বলি ? জানিনা তো কিছুই। আজ-কালকার থিয়েটার মাঝে মাঝে দেখি ; কেমন নেশা! সব কাজের মধ্যেও থিয়েটার যেন টানে। দেখি, আজ-কালকার সব নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, সু-শিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, কত নতুন নাটক, কত দর্শক, কত হাততালি, সোরগোল, হৈ-হৈ, সেই ফুটলাইট—সেই দৃশ্যের পর দৃশ্য—সেই যবনিকা পড়ার সময় ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ,—আর কত কথাই না মনে পড়ে! আমরাও তো একদিন এমনি করে সাজতেম, সেই সেকালের মত দর্শক, সেই সেকালের মত রঙ্গসাথী, সেকালের সাজপোষাক, সেকালের নাটক, সেকালের গ্যাসের ফুটলাইট, সেকালের আবহাওয়া। দুর্ব্বল স্মৃতি সেকালে অতীতের কোন্ স্বপ্নরাজ্যে টেনে নিয়ে যায় ; মনে হয় সেদিনকার কথা সব গুছিয়ে বলি—যাকে ভুলিনি, ভুলতে পারিনি যাকে সত্যিই প্রাণের সবটা দিয়ে ভালবাসতেম, আজও যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তার কথা আজকার নব অভিনেত্রীদের কাছে গল্প করি। কিন্তু সব কেমন গুলিয়ে যায়। যাক্। তবু আমি সে দিনের কথা কিছু বলবো, বলবার চেষ্টা করবো। সরল, সত্য কথা ; যা পড়ে আজ-কালকার পাঠক ও দর্শক বুঝবেন, কি মাটির তাল নিয়ে, পুকুর থেকে পাঁক তুলে—এদেশে যাঁরা থিয়েটারের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা কেমন সব পুতুল গড়েছিলেন ; এবং তাঁদের হাতের সে গড়া পুতুল কি করে কথা কইতো, ষ্টেজের উপর চলতো ফিরতো, দর্শকগণকে আনন্দ দিত, তৃপ্তি দিত।

আমি গরীবের মেয়ে ছিলেম। থিয়েটার করতে যাবার আগে থিয়েটার কখনও দেখি নি। কি ক'রে যে থিয়েটারের মধ্যে পড়লেম, সেই কথাই বলি। সে অনেক দিনের কথা, তারিখ ঠিক মনে নেই। বাগবাজারের নিয়োগীবাবুদের বাড়ীর শ্রীযুক্তবাবু ভুবনমোহন নিয়োগী তখন গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক ; আমি এঁরই থিয়েটারে প্রথম যাই। তখন আমার বয়স নয় কি দশ, এমনি হবে। আমাদের বাড়িতে গঙ্গাবাঈ ব'লে একজন বড় গায়িকা থাকতেন ; ইনি কালে একজন বড় অভিনেত্রীও হয়েছিলেন। এঁর কথা পরে বলবো। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজনাথ শেঠ দুজন ভদ্রলোক "সীতার বিবাহ" নামে একখানা নাটক খুলবেন ব'লে, এই গঙ্গামণিকে গান শেখাতে আসতেন। গঙ্গা তখনও পর্য্যন্ত কোন থিয়েটারে ঢোকেন নাই, এই বোধ হয় তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি। তাঁরা যখন শেখাতেন, আমি খেলাধুলা ফেলে, চুপটী করে ব'সে সে সব একমনে শুনতেম। এঁরাই একদিন আমাকেও খেলাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি,

হাতা বেড়ীর মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাচঘরের মাঝখানে ফেলে দিলেন। ছোট্ট মেয়ে, কিছুই জানিনা, কখনও অতগুলি ভদ্রলোকের মাঝখানে এর পূর্ব্বে যাইওনি ; থিয়েটার যে কি জিনিষ তাও জানিনা। ভয়ে ভাবনায় লজ্জায় কেমন একরকম হয়ে গেলেম। ঠিক যেন হংস মধ্যে বক। আমার যাওয়ার কথাবার্ত্তা পূর্ণবাবু ও ব্রজবাবু ঠিক করে দিলেন। গিয়ে দেখলেম, পরে জেনেছিলেম গ্রেট্ ন্যাশনালের দলে অভিনেত্রী আছেন সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, নারায়ণী, লক্ষ্মীমণি, কাদম্বিনী আর রাজকুমারী। হায়! যাঁদের নাম করছি আজ তাঁরা কোথায়!

রাজকুমারীকে সকলে রাজা বলে ডাকতো। থিয়েটারে তার খুব প্রতিপত্তিও ছিল। এই রাজা আমাকে বড় স্নেহ করতো। ছেলেবেলায় আমার স্বভাব ছিল বড় চঞ্চল। ছট্ফটে ছিলেম ব'লে দলের সকলেই প্রায় আমাকে ধমকাতো, ব'কতো ; আমি বকুনি খেয়ে জড়সড় হ'য়ে ব'সে থাকতেম ; বকুনির মাত্রা বেশী হ'লে কখনও হয়তো কেঁদেও ফেলতেম ; রাজা আমাকে আদর করতো, যত্ন করতো ; কেউ আমায় বকলে রাজা আমার হয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করতো ; কাজেই আমিও এই অভিনেত্রীর বড় নেওটো হয়ে পড়েছিলেম। আমি গরীবের মেয়ে ছিলেম ; জামা কাপড়ের কোন পারিপাট্যই আমার ছিল না। জামার অভাবে অনেকদিন আঁচল গায়ে ঢাকা দিয়ে থিয়েটারে যেতেম ; রাজা আমায় দুটো জামা তৈয়ারি করে দিয়েছিল। ক্ষিদে পেলে এই রাজাই আমায় খাবার কিনে দিত। থিয়েটারে ঘুমিয়ে পড়লে সে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে গাড়িতে তুলে দিত। এ সব আজ কত বৎসরের কথা ; কিন্তু রাজার এ স্নেহ রাজার সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মতই আমার প্রাণের চারিধারে যেন সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ সব ভোলে, কিন্তু স্নেহের ঋণ বোধ হয় কখনও ভোলে না!

আমি যখন গ্রেট্ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম যাই, তার কত বৎসর পূর্ব্বে মনে নাই,—তখন শুনলেম যে জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল বাবুরা ছিলেন খুব বড়লোক। তাঁদের বাড়িতে টিকিট বেচে ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছিল, সে দলে কিন্তু অভিনেত্রী ছিলনা ; পুরুষে স্ত্রীলোকের "পার্ট" সাজতো। তারপর থিয়েটারে অভিনেত্রীর চলন করেন বেঙ্গল থিয়েটারের মালিকরা। বীডন ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাড়ির সামনে বেঙ্গল থিয়েটার ছিল। খোলার চাল, মাটির মেঝে, শালের খুঁটী, তাকে খোলার ধাবড়া ব'ললেও চলে। ছাতুবাবুর দৌহিত্র ৺চারুচন্দ্র ঘোষ এবং ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ এই থিয়েটারের সৃষ্টি করেন। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বড়লোক

এঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ (এঁকে সকলে ন্যাদাড়ু গিরিশ বলতো), ৺হরি বৈষ্ণব, মথুরবাবু প্রভৃতি। গ্রেট্ ন্যাশনালের আগে বেঙ্গল থিয়েটার। এঁদের দলে অভিনেত্রী ছিল,—এলোকেশী, জগত্তারিণী, শ্যাম এবং গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত)। এই বঙ্গল থিয়েটারের সহিত আমার অভিনেত্রী জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ থিয়েটারে আমি অনেকদিন কাজ করেছিলেম। কিন্তু এখানে নয়, সে কথা আমি পরে বলবো।

গ্রেট্ ন্যাশনালে আমার প্রথম পার্টের কথা বলি। হ্যাঁ, ভাল কথা।

বীডন ষ্ট্রীটে, যেখানে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী ছিল, সেইখানে এই গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল। কাঠের বাড়ী, করগেটের ছাদ, তখনকার মধ্যে বেশ ভব্যিযুক্ত। থিয়েটার হ'ত এই বাড়ীতে বটে, কিন্তু আমাদের রিহার্সাল হ'ত গঙ্গার ধারে নেউগী বাবুদের বৈঠকখানা বাড়ীতে। এখন যেখানে অন্নপূর্ণার ঘাট, উহারই নিকটে এই বৈঠকখানা বাড়ী ছিল ; গঙ্গার গর্ভে এখন সে সুন্দর বাড়ী আত্মগোপন ক'রেছে। তার বুকের উপর দিয়ে এখন রেল চলে, মানুষ হাঁটে, মাঝিরা নৌকা বেয়ে যায়।

আমার যাওয়ার পর বেণী সংহার নাটকের মহলা আরম্ভ হয়।

আমার প্রথম "পার্ট" এই বেণী সংহার নাটকে। একটি পরিচারিকা বা দাসীর ভূমিকা। দুই চারি ছত্র কথা। মুখস্থ করেছি, রিহার্সেলও দিয়েছি। বক্তব্য সামান্য ; মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন, দুঃশাসনের রক্ত পান ক'রে, সেই রক্ত-মাখা হাতে অভিমানিনী দ্রৌপদীর বেণী বাঁধতে আসছেন, এই খবরটি আমায় দ্রৌপদীকে দিতে হবে। দিতে হবে তো দিতে হবে ; কিন্তু কে জানতো তখন যে এই সামান্য কথা ক'টা ষ্টেজে বেরিয়ে ব'লে আসার কি বিপদ,—অবশ্য প্রথম পার্ট নিয়ে বেরুনর দিন! সকলে যে যার 'পার্ট' অভিনয় করে বেরিয়ে আসছে, শেষকালে এল আমার পালা! বেরুনর আগে বুকের ভেতর সে কি কাঁপুনি, ভয়ে তো জড়সড় হ'য়ে যাচ্ছি। অত লোকের সামনে বেরিয়ে বলতে হবে, এর আগে কখনও তো অত লোক এক সঙ্গে দেখিনি!

গরীবের মেয়ে ছিলাম আমি। একটি ভাই ছিল, সে ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। খুব অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমরা জাত-বৈষ্ণব ছিলাম, চার-পাঁচ বছর বয়সেই আমাদের তখন বিয়ে হ'ত। আমারও তাই হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ে হয়েছিল এই পর্য্যন্ত ; স্বামী কখনও গ্রহণ করেননি, তাঁকে আর কখনও দেখিও নি। বিয়ে দেওয়া একটা রীতি ছিল বলেই বোধ হয় বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। মা তো ভাল ক'রে প্রতিপালন করতে পারতেন না ; পাড়ার অবৈতনিক স্কুলে কিছু-কিছু পড়তাম, আর খেলা করে বেড়াতাম। মা-ই জোর করে থিয়েটারে দিয়েছিলেন, যদি পেটের ভাত করে খেতে পারি এই জন্য।

পার্ট নিয়ে বেরুবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু পেটের ভাত চাল হ'য়ে গিয়েছে। উইংসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, পাও কাঁপছে, কি বলবো, কি করবো,—ভুলে গেছি। এক একবার মনে হ'চ্ছে আর বেরিয়ে কাজ নেই, ছুটে পালাই। কিন্তু ভয়ও আছে, সকলে কি ব'লবে, আর পালাবই বা কোথায় ? ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন তখনকার গ্রেট্ ন্যাশনালের ম্যানেজার। সেই ধর্ম্মদাসবাবুর কথা আমাকে অনেকবারই ব'লতে হবে ; ধর্ম্মদাসবাবু বাবু ভুবনমোহন নেউগীর বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিলেন। শুনেছি, কলিকাতা গড়ের মাঠে লুইস্ থিয়েটার ব'লে একটা ইংরাজী থিয়েটার কোম্পানী আসে। এঁদেরই থিয়েটার বাড়ী দেখে ধর্ম্মদাসবাবু তারই আদর্শে ও অনুকরণে, গ্রেট্ ন্যাশনাল তৈয়ারী করেন। বাঙ্গালায় ষ্টেজ তৈয়ারির যা-কিছু বাহাদুরী তা নাকি সব-ই এই ধর্ম্মদাস বাবুর! তাঁরই বন্ধু ভুবনবাবুর টাকায় বাঙ্গালা দেশে প্রথম পাকা বাড়ীতে "থিয়েটার হাউস্" হয় ; এর পূর্ব্বে কিন্তু খোলার চালে বেঙ্গল থিয়েটার হয়েছিল, সে কথা আগেই ব'লেছি। এখানে, গ্রেট্ ন্যাশনালের উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, বোধ হয় সে কথা ব'ল্লে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কথাটা যখন উঠলো, বলেই রাখি। অবশ্য এ সব আমার পরে শোনা কথা।

একদিন ভুবনবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু বেঙ্গল থিয়েটার দেখতে যান ; বোধ হয় "পাশ" নিয়েই যান, কিম্বা এই রকম একটা কিছু, জানা শুনা ছিল, বন্ধু ভাবেই গিয়ে থাকবেন ; ভেতরে গ্রীণ রুমের মধ্যেও যান। বেঙ্গল থিয়েটারে তখনকার কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু, কি কারণে ঠিক জানিনা ওঁদের ভিতরে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। একটু বচসাও হয়। এই মনোমালিন্য হ'তেই গ্রেট্ ন্যাশানালের উৎপত্তি। ভুবনবাবু ধনবান ছিলেন ; তিনি নীরবে এ অপমান সহ্য করতে পাল্লেন না ; ধর্ম্মদাসবাবুর সাহায্যে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে থিয়েটার ক'রলেন। তাঁর সেই থিয়েটারই গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, আর তার প্রথম ম্যানেজার আমার যতদূর মনে হয়, স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর। তিনিই বাঙ্গালার

প্রথম ও প্রধান ষ্টেজ ম্যানেজার।

তারপর যে কথা হচ্ছিল। আমার সেই প্রথম ষ্টেজে বেরুনর কথা। আমি তো উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি; বোধ হয় একটু বেরুতে দেরীও হ'য়ে থাকবে, ধর্ম্মদাসবাবু তাড়াতাড়ি এসে আমায়·ঠেলে ষ্টেজের বা'র ক'রে দিলেন।

আমি বেরিয়েই দ্রৌপদীকে প্রণাম করে, হাত জোড় ক'রে, যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই আমার বক্তব্য যা ব'লে গেলাম। খুব সাজ-পোষাক-পরা গর্ব্বিতা পাণ্ডব মহিষীর সামনে যেমন সঙ্কুচিত হ'য়ে বলতে হয়, তেমনি সঙ্কুচিত ভাব আপনি আমার হয়ে প'ড়লো। দর্শকদের দিকে ফিরেও চাইনি! কিন্তু তাঁরা আমার অবস্থা দেখে দয়া ক'রেই হোক, কিম্বা যে কারণে হোক—আমার বক্তব্য শেষ হ'লে আমায় খুব হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন! আমি কোন রকমে কাজ সেরে পিছনে হেঁটে—ধর্ম্মদাসবাবু উইংসের পাশ থেকে আমায় সেই রকম ক'রে চলে আসতেই বলেছিলেন,—ভিতরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ধর্ম্মদাসবাবু আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে, আমার পিট চাপড়ে ব'ল্লেন, "চমৎকার হ'য়েছে, খুব ভাল হ'য়েছে"—ইত্যাদি। কত আশীর্ব্বাদ করলেন। এখনও আমার ধর্ম্মদাসবাবুর সেই পিট-চাপড়ান—সেই সস্নেহ আশীর্ব্বাদ মনে পড়ে, আর চোখ সজল হ'য়ে ওঠে। প্রথম জীবনের কর্ম্মসঙ্গী সব—হাতে ধ'রে যাঁরা আমায় রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের আজ হারিয়ে ব'সে আছি! হাত-তালি পেয়ে আর ধর্ম্মদাসবাবুর মুখে 'বেশ হয়েছে' শুনে ভারি আহ্লাদ হ'ল। ধর্ম্মদাসবাবু ব'ল্লেন, "যা-যা পোষাক ছেড়ে ফেলগে যা।" লাফাতে লাফাতে সাজ-ঘরে গেলাম। যেন দিগ্বিজয় ক'রে চ'লেছি। ৺ কার্ত্তিক পাল, আমাদের তখনকার "ড্রেসার" (বেশকারী) ব'ল্লেন, "আয় পুঁটি, আয়; বেশ হ'য়েছে।" এই আমার অভিনেত্রী জীবনের প্রথম "পার্ট"—একটি পরিচারিকার। এর পরে, কালে, কত রানী সেজেছি, কত কি সেজেছি; কিন্তু জীবনের সুখস্বপ্নের মত—এই 'ছোট্ট দাসীর' পার্টটির কথা মনে করতে আজ কত আনন্দই না হয়!

তখনকার অভিনয়ে কোন আড়ম্বর ছিল না। একটা কিছু সেজেছি, একটা কিছু ক'রতে হবে, এ ভাব নয়। যেন সব ঘরকন্নার কাজ, ষ্টেজে বেরিয়ে সকলে করে আসছে। তখনকার শিক্ষকদের বিশেষ উপদেশ ছিল, দর্শকদের দিকে চেয়ে কখনও অভিনয় ক'রবে না; মনে ক'রে নিতে হবে দর্শক যেন কেউ নেই,

আমরা আমাদের যে কাজ, তা আপনা-আপনির মধ্যে করে যাব। কেউ দেখছে কিনা, তারা কি বলবে বা ভাববে, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখবার দরকার নেই। কালে বুঝতে পেরেছিলুম, এরূপ ভাবে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য ছিল অভিনয় বিষয়ে একাগ্রতা আনবার জন্তেই। সকল ভুলে, তন্ময় হয়ে যে যার কাজ যাতে ভাল ক'রে ক'রে যেতে পারি, এই নিমিত্ত।

বেণীসংহার নাটক কতদিন চলেছিল, তা ঠিক মনে নেই। এই বেণীসংহার নাটকের পরেই আমার মনে হ'চ্ছে "হেমলতা" নাটকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই নাটকের রচয়িতা ৺ হরলাল রায়। হেমলতাই নায়িকা; তার নামেই বই। কথা উঠলো, কে হেমলতা সাজবে? নানা আলোচনার পর স্থির হ'ল, আমাকেই হেমলতা সাজতে হবে। আমার তখন কিন্তু হেমলতা সাজবার বয়স নয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কেন যে আমাকেই মনোনীত করলেন, তা বলতে পারিনা। আমাকেই হিরোইন সাজতে হবে, ভারি আহ্লাদ, কিন্তু ভয়ও কম নয়। তবে ভরসার মধ্যে, ক্রমে একটু সাহসও তো বেড়েছে, আর শিক্ষকদের গুণ। সত্যসখা বোধ হয় এ বইয়ের 'হিরো' বা নায়ক। সে পার্ট দেওয়া হ'ল, একটি অল্পবয়স্ক যুবককে। এ সত্যসখার সত্য নামটি কি আমার মনে নেই। • কিন্তু তার অভিনয়ের কিছু কিছু এখনও মনে আছে, বিশেষতঃ তার সেই পাগলের দৃশ্যের কথা। গেরুয়া পরা, গেরুয়া চাদরে কোমর বাঁধা, উত্তরীয় গেরুয়া, এলোমেলো ভাবে কতক কাঁধে কতক মাটিতে লুটুচ্ছে, আর সেই প্রাণ-পূর্ণ অভিনয়—"ভাঙ্গ্ ভাঙ্গ্, রাজা বেটাও বোকা ঐ—ঐ ভাঙ্গলে সব,—হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্ ক'রে সব ভাঙ্গলে", এ সকল এখনও মনে পড়ে। আর সেই বহু দিনের পুরাণো স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, সেই সব ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী ও সঙ্গীনীগণ, যাদের তখন কত আপনার মনে হ'ত!

বলেছি তো, এখনও মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখি, কত জাঁক-জমক, কত পোষাক, সিনের চটক, কিন্তু তখনকার সে প্রাণ-পূর্ণ অভিনয়, সে শাদা মাটা ভাব—তার অভাব যেন এখনও অনুভব করি। কিন্তু কেন, তা বলতে পারি না।

হেমলতার পর আমাদের যে নতুন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম "প্রকৃত বন্ধু"। এ নাটকে নায়ক সাজলেন স্বর্গীয় মাধুবাবু। এঁর পুরা নাম বাবু রাধামাধব কর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ৺ আর, জি, করের ভাই। আমি যখন থিয়েটারে যাই, তখন এই মাধুবাবুও আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন।

ইনি অভিনেতাও ছিলেন ভাল, সুগায়কও ছিলেন। শিক্ষক ব'লেও এঁর

খ্যাতি ছিল খুব। মাধুবাবু নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িকা। বইএর লেখা এমন কিছু নয়। সাদা কথা। গল্পটি এই,—রাজা আর তাঁর সখা এক রাজকুমার মৃগয়া করতে এক বনে গেলেন। সে বনে একটি বন-বাসিনী যুবতী থাকতো। নাম বনবালা। তাকে দেখে রাজারও প্রণয় হ'ল, তাঁর সখারও প্রণয় হ'ল। কিন্তু এর কথা ও জানে না, ওর কথা এ জানে না। তারপর কিন্তু দু'জনেই, দু'জনের মনের কথা জানতে পারলে। রাজা নিজের চিত্তকে দমন ক'রে ব'ললেন—"সখা, তুমি এই বন-বাসিনীকে বিবাহ কর।" বন-বাসিনীও ভালবাসে রাজার সখাকে। রাজার সখার নাম কুমার রাধামাধব সিং। মাধুবাবুর নামের সঙ্গে নাটকের যে নামের মিল, তারও একটা রহস্য আছে। যিনি নাটক লিখেছেন, তাঁর নাম ৺ দেবেনবাবু, কি পদবী আমার মনে নেই। তিনি মাধুবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন; তাই বন্ধুর নামে নাটকের নায়কের নামকরণ করেছিলেন। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চমৎকার নিদর্শন বটে! এদিকে বনবাসিনী নায়িকা বনবালা প্রেমের টানে, তার মা বাপকে ছেড়ে, তার সেই বনের কুটীর ছেড়ে, একাকিনী একেবারে রাজধানীতে এসে হাজির। রাজধানীর বাড়ী-ঘর দেখে, সে একেবারে হক্‌-চকিয়ে গেছে। হেঁটে হেঁটে—অভ্যাস তো নেই,—পরিশ্রমও হয়েছে খুব; নগরের গাছতলায় ব'সে সে জিরুচ্ছে আর ভাবছে, এমন সময় রাজবাড়ীর একটি দাসী কার্য্যোপলক্ষে সেখানে এল; সে মেয়েটিকে ব'সে থাকতে দেখে, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, কথায় কথায় জানতে পারলে যে, মেয়েটি রাজার সখা কুমারকেই ভালবাসে আর তাঁর খোঁজেই, বন ছেড়ে, সেখানে এসে প'ড়েছে। দাসীর দয়া হ'ল; সে তাকে সঙ্গে ক'রে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। রাধামাধব সিংহের সঙ্গে তার দেখাও হ'ল, রাজার সঙ্গেও দেখা হ'ল। সখা কুমার রাজাকে বল্লেন, "সখা তুমি ইহাকে বিবাহ কর।" রাজা কিন্তু বনবালার মনের কথা জানলেন; জানলেন যে, সে তাঁর সখাকেই ভালবাসে, আর তার জন্যই সব ছেড়ে অতদূর এসেছে। রাজা উদ্যোগী হ'য়ে রাধামাধব সিংহের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। বাস্—নাটকের শেষ। মোট কথা এই, কিন্তু এর সঙ্গে উপসঙ্গ ছিল ঢের। সে সব কথায় আর কাজ নেই। এখন আমার পার্টের কথা, যা বলছিলেম, বনবাসিনী নায়িকাও ছিল যেমন বুনো সরল, আমিও তখন ছিলাম ঠিক তেমনি—একেবারে বুনো না হোক, সাদা সিধে, হাবা গোবা! কাজেই,—"পার্ট"টি ঠিকই মানিয়েছিল। তবে আমাকে সাজাতে বেশকারীর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। ছোট ছিলাম তো? কিন্তু

সাজতে হত ধেড়ে যুবতী!

এমনি মনের আনন্দে তখন অভিনয় করতাম; ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান, ঐ খেলা। খুব ভাল লাগতো। নতুন নতুন পার্ট সাজবার সখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতো। আমি যে অভিনয় করতাম, তা কিন্তু আমার গুণে নয়; তখনকার শিক্ষকদের শেখাবার গুণে, তাঁদের পরিশ্রমে ও যত্নে। কি কষ্ট করেই না তাঁরা আমার মত একটা নেহাৎ বুনোকে 'হিরোইন' সাজিয়ে দর্শকদের সামনে ধ'রে দিতেন।

আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত শক্ত নাটকও প্লে হ'তে লাগলো। এবার দীনবন্ধুবাবুর সাহিত্য-বৃক্ষের সুন্দর ফুল সেই লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তাতে ললিতমোহন বোধ হয় মহেন্দ্রবাবু সেজেছিলেন, হেমচাঁদ কে সেজেছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে নদেরচাঁদ বেলবাবু আর কর্ত্তা নীলমাধববাবু, তা বেশ মনে আছে।

তারপর হ'ল নবীন তপস্বিনী, এতে অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন; তিনিই ছিলেন প্রধান অভিনেতা। 'জলধর' তিনিই সেজেছিলেন, আর ধর্ম্মদাদা 'বিজয়', আমি 'কামিনী', লক্ষ্মী ও নারায়ণী 'মালতী' ও 'মল্লিকা', রানী 'কাদম্বিনী' আর 'জগদম্বা' ক্ষেতুদিদি। যেমন জলধর তেমনিই জগদম্বা। দু'জনকেই কি সুন্দর মানিয়েছিল। এই জলধর সেজে অর্দ্ধেন্দুবাবু

'মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥'

এই দুটি চরণ বলতে বলতে ষ্টেজে এমনি অঙ্গভঙ্গী করে ঘুরে বেড়াতেন যে, সে এক অপরূপ দৃশ্য, সে এক বিচিত্র চিত্র! সে লিখে বোঝাবার নয়, তখনকার জলধর না দেখলে কারুর মুখে শুনে বা কারু লেখা পড়ে তার সম্বন্ধে ধারণা করাই অসম্ভব।

সে সময় শুধু যে নাটক প্লে হ'ত তা নয়, মধ্যে মধ্যে অপেরাও হ'ত, প্রহসনও হ'ত। 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'আদর্শ সতী', 'কনক-কানন', 'আনন্দলীলা', 'কামিনীকুঞ্জ', এমনই ধারা কত অপেরা, আর 'সধবার একাদশী', 'কিঞ্চিৎ জলোযোগ', 'চোরের উপর বাটপাড়ি', এমনি ধারা কত প্রহসন।

একবার অর্দ্ধেন্দুবাবুর মুখে-মুখে-গড়া একটি প্রহসন আমাদের প্লে করতে হয়েছিল। সে ভারি মজার। একদিন বড় বর্ষা। অভিনয় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না। দর্শকবৃন্দ ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। আমরাও যে

কি করি বসে বসে তাই ভাবছি, এমন সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু বললেন, "র'স, একটা কাজ করা যাক, ধর্ম্মদাস, তুমি বাইরে বেরিয়ে বল, মশায়রা ব্যস্ত হবেন না, একখানি ছোট প্রহসন দেখুন; আপনাদের শুধু শুধু বসে থাকতে হবে না; আর তার মধ্যে বৃষ্টিও ধরে যেতে পারে।"

প্রহসনের নাম হ'ল "মুস্তফি সাহেব্‌কা পাক্কা তামাসা"। অর্দ্ধেন্দুবাবু হ'লেন মুস্তফি সাহেব, ক্ষেতুদিদি হ'ল তার মা, আর লালপেড়ে শাড়ী পরে আমি হ'লাম তার বৌ। রিহার্স্যাল মুখে মুখে চল্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে সিন সাজান হ'তে লাগল। একখানি ভাঙ্গা একতলা ঘরের সিন দেওয়া হ'ল। ইট সাজিয়ে পায়া করে তার ওপর তক্তা পেতে টেবিল করা হয়ে গেল, সাদা ছেঁড়া থানের খানিকটা সেই টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে চাদরের অভাব পূরণ করা হ'ল।

এদিকে দশ মিনিট বিশ্রামের পর কনসার্ট বাজতে লাগল। অর্দ্ধেন্দুবাবু সাজঘরে গিয়ে অনেক দিনের একটা পুরাণ ইজের আর একটা ছেঁড়া কোট পরে হাতে মুখে কালি মেখে ত বেরিয়ে পড়লেন। আমাকে সেই ভাঙা সিনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে গেলেন, "তুই একবার একবার উঁকি মেরে দেখবি, আর ভয়ে মুখ সরিয়ে নিবি।" ক্ষেতুদিদিকে বড় কিছু বলতে হ'ত না, একটু আভাষ দিলেই সে সব ঠিক করে নিতে পারত।

মুস্তফি সাহেব ত বেরিয়ে সেই ভাঙা টেবিলের ওপর সাহেবী ধরনে বসে এক হাতে কুণী আর এক হাতে শুণ-ছুঁচ না নিয়ে শুক্‌নো পাঁউরুটি খেতে লাগলেন, আর সাহেবের মত ঘাড় বেঁকিয়ে দর্শকদের দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর কিছু বলবার আগেই তাঁর সেই মিটির মিটির চাউনি আর সাহেবী ভাবভঙ্গী দেখে দর্শকরা ত হেসেই অস্থির। এর ওপর মুস্তফি সাহেবের কথা! যাক্‌!

সাহেব ছেলে, শুধু শুক্‌নো পাঁউরুটি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খাচ্ছে দেখে মা বধূকে বল্লেন, "আমাদের ছোলার ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট এনে দাও ত মা।" বালিকা-বধূ তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা বাটিতে ছোলার ডাল ও একখানি রেকাবিতে একটু মোচার ঘণ্ট এনে মা'র হাতে দিলেন। মা ভয়ে ভয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে অতি আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "বাবা শুধু রুটি খাচ্ছিস, একটু ডাল আর এই তরকারিটুকু দিয়ে খা।" এই আর কোথা আছে! সাহেবকে বাঙালির তরকারি খেতে বলা! সাহেব ত

লাফিয়ে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "কা! হামি বাঙ্গালা তরকারি খাতা?" রকম দেখে ভয়ে হাত পা' কেঁপে মা'র হাত থেকে ডালের বাটি আর মোচার ঘন্ট মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মা ভয়ে ভয়ে বৌয়ের হাত ধরে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিন্তু সেই শুক্‌নো 'তেবাস্‌টে' রুটি ত আর গেলা যায় না। তাই এদিক ওদিক চেয়ে সেই ছড়ান ডাল আর একটু মোচার ঘন্ট মেঝের ওপর থেকে তুলে নিয়ে খেয়ে সাহেব এমনই মুখভঙ্গী করলেন যে তাতে বেশ বোঝা গেল, তরকারিটুকু তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরজার দিকে তাকিয়ে "এমা, এমা, আম্‌মা" বলে ডাকা চারিদিকে চাওয়া; ছেলের গলা পেয়ে মার "কি বাবা কি বাবা" বল্‌তে বল্‌তে ব্যস্তভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান, সাহেবের সেই ছোলার ডাল দেখিয়ে বলা, "এমা, এ—মাফিক কেয়া লে আয়া? দেও তো হামাকে";—আর অমনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে "খাবে বাবা, আন্‌ব বাবা" বলে চলে যাওয়া—সে সব দৃশ্য যে না দেখেছে সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ক্ষেতুদিদির তখনকার কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, কি তদ্গতভাব দৃষ্টি!

এমন সময় মিউনিসিপালিটির একজন চাপরাশি একখানা নোটিশ হাতে করে সেখানে এসে উপস্থিত। রাস্তায় একমুঠো জঞ্জাল ফেলা হয়েছে এ তারই নোটিশ। সে এসে যেমন বলা, "সাপো নটিশ অছি:" অমনি সাহেব তাকে তেড়ে গিয়ে বল্‌লেন, "এই কালা বাঙ্গালী নীচু যা আবি।" উড়ে ত তার রকম দেখে, দু'পা সরে গিয়ে বল্‌লে, "ও বাবা, নীচু যাব কোথা, পাতকোয়ার ভেতর না কি?" এই বলে ত সে চলে গেল। তারপর মুস্তফি সাহেবের পা তুলে তুলে কি পল্‌কা নাচ; সে লম্বা লম্বা ঠ্যাং উঁচু করে কি লাফান, আর তার সঙ্গে গান। গানের ত মাথা মুণ্ডু নেই—

"হাম বড়া সাব হায় দুনিয়ামে, তোম্ ছোট সাব হায় দুনিয়ামে।
তোম খাতা চিংড়ি মাছ, হাম খাতা হায় পেঁয়াজ॥"

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দর্শকের দিকে সভঙ্গী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ। দর্শকদের মধ্যে যে কি রকম হাসির রোল পড়ে গেল, তা সবাই বুঝতে পারচেন, আমার না বল্‌লেও হয়।

এই ভাবে তিনি দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। বৃষ্টিও ধরে গেল, দর্শকরা আনন্দ করতে করতে যে যার বাড়ী চলে গেলেন। আমরাও হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বাড়ী ফিরলাম।

সেই থেকেই বোধ হয় অর্দ্ধেন্দুবাবুর 'সাহেব' নাম হ'য়েচে। এখন অবশ্য চারিদিকে সে নাম খুব জাহির হয়ে গেছে।

মুস্তফি সাহেবের মুখে-মুখে-গড়া প্রহসনের ত এইভাবে অভিনয় হয়ে গেল। এমনই ভাবে কাপ্তেন বেলও (৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) আবার মাঝে মাঝে ক্লাউন সেজে ষ্টেজে নামতেন। সে ক্লাউনের সাজ-সজ্জা, কথাবার্ত্তা, নাচা-গাওয়া সবই তাঁর নিজের গড়া। তখন নীলদর্পণের অভিনয় খুব সমারোহে চলছিল, সেই সময় ভুনিবাবু (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) আমাদের থিয়েটারে এলেন, এর আগে ত তাঁকে দেখিনি, শুনলাম ইনি জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল বাড়ীতে যে থিয়েটার হয় তাতে নীলদর্পণে ছোটবৌ সাজতেন। এবারে আমাদের এখানে তাঁকে আর সেই ছোট বৌটি সাজতে হল না, সাজলেন তাঁর স্বামী বিন্দুমাধব। পর পর আরও অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রেঁা, একেই কি বলে সভ্যতা, ৺ উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, ৺ মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা ও জেনানা যুদ্ধ বলে আর একখানি প্রহসন। জেনানা যুদ্ধ যতদূর মনে হচ্ছে, বোধ হয় একখানা আলাদা বই নয়, দীনবন্ধুবাবুর জামাই বারিকের একটা অংশ—দু সতীনের ঝগড়া। আর কত বইয়ের বা নাম করব? একখানি বইয়ের অভিনয় যেমনি আরম্ভ হত অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি বইয়ের রিহার্সাল সুরু হয়ে যেত। নাটকের এই রিহার্সাল সন্ধ্যের পরই হ'ত, কেননা অনেকে আপিসে চাকুরী করতেন কিনা, আর দিনের বেলায় চল্‌ত অপেরার রিহার্সাল। সে সময় সবায়ের খুব উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল, রিহার্সালের সময় কেউ বড় কামাই করতেন না।

কেন জানিনা, আমার ত কেবলই মনে হ'ত, কখন্ গাড়ী আস্‌বে, কখন আমি থিয়েটারে যাব। অন্য অন্য সকলে কেমন করে চলা-ফেরা করে গিয়ে তাই দেখব। আমার ত খাওয়া শোয়াই মনে থাকৃত না, বাড়ীতে যতক্ষণ থাকৃতাম ঘরের ভেতর লুকিয়ে এই 'কাদু' এমনই করে বলেছিল, ঐ 'লক্ষ্মী' এমনই করে বলেছিল, এই করতাম! তখন ত আমার বয়স বেশী ছিল না, নিজের আলাদা ঘরও ছিল না, কাজেই আমায় সকলে দেখে ফেলত আর হাসত, আমি অমনই ছুটে পালিয়ে যেতাম।

আমার থিয়েটারে প্রবেশ করবার কতদিন পরে ঠিক মনে নেই, আমাদের

থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরুল। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। মা আমাকে একলা ছেড়ে দিতেন না, তিনিও আমার সঙ্গে গেলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের প্রথমে দিল্লীতেই যাওয়া হয়। গেলুম ত দিল্লী। গিয়ে দেখি সে মুসলমানের রাজ্য, বাঙ্গালীর মুখ বড় দেখতে পেতাম না। সব কেমন চেহারা, রকমারী দাড়ি, রকমারী সাজ-পোষাক, কথা বোঝবার যো নেই, এক একজনের চেহারা দেখলে ভয়ে প্রাণ আঁৎকে ওঠে! বাঙ্গালা থেকে অতদূরে এমন একটা আজগুবি দেশে গিয়ে আমি ত ভয়েই কেঁদে অস্থির। আমাদের সে কি কান্না! সে কান্নার কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। সেখানে ভিস্তিতে আমাদের জল দিত, সে জল আমরা কোন দিনই খাইনি, এমন কি প্রথম প্রথম আমরা সে জলে নাইতামও না। ইঁদারা থেকে ঘটি করে জল তুলে খেতাম আর নাইতাম। ক্রমে থাক্‌তে থাক্‌তে আমাকে ভিস্তির জলেই নাইতে হ'ল। রঙ্‌ত ধুতে হবে, অত রাত্রে কে জল তুলে দেবে, মা যে তখন ঘুমিয়ে পড়বেন। তবে মা কোনদিন সে জল স্পর্শও করতেন না, নিজে জল তুলে সব করতেন। আপনি রসুই করে একবেলা খেতেন, রাত্রে একটু দুধ আর এক আধটা ফল খেয়ে থাক্‌তেন। তিনি আমার জন্ম কত কষ্টই না সহ্য করেছেন। আমার একটি ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না; কিছুদিন আগে আমার সেই ভাইটি দশ বছরের হয়ে মারা যায়। তারপর থেকে স্নেহময়ী মা আমার সব সময় আমায় কাছে রাখতেন, এক দণ্ডের জন্ম কাছ-ছাড়া করতে চাইতেন না। কলকাতায় তিনি প্রায় রোজই আমার সঙ্গে থিয়েটারে আসতেন, কাজ শেষ হওয়া অবধি বসে থাকৃতেন, তার পর আমায় সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতেন।

যাক্, দিল্লীতে অভিনয় সাত আটদিন হয়েছিল। সেখানে বড় সুবিধে হয় নি! তবে আমরা আরও দিন সাতেক সেখানে ছিলাম! যা যা দেখবার, আমাদের সব দেখান হয়েছিল। একদিন ত আমরা সবাই গরুর গাড়ী চেপে কুতব মিনার দেখতে গেলাম। পথের মাঝখানে এক মহা বিপদ। একটা বাঘ আমাদের গাড়ীর গরুকে তাড়া করে ছুটে এল। চারিদিকে হৈ চৈ চীৎকার, মশাল জ্বালা, তার সঙ্গে আমাদের কান্না। সে কি কাণ্ড! তবে বাঘটা গরু ধরতে পারেনি, আমাদের সঙ্গে অনেক অনেক লোক ছিল কিনা। সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে আমরা দিল্লী ছেড়ে লাহোরে রওনা হ'লাম।

লাহোরে আমরা অনেকদিন ছিলাম। তবে অভিনয় রোজ হ'ত না, বোধ করি দশ বার দিন মাত্র হ'য়েছিল। নাচগানের বইই সেখানে বেশী চলত, নাটকের অভিনয় বড় হ'ত না।

অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায়ই বড় বড় লোকেদের বাড়ী তাঁর নিমন্ত্রণ হত। তাঁরই জন্যে আমাদের সেখানে অত বেশী দিন থাক্‌তে হয়েছিল। আমরা সকলেই কিন্তু সেখানে বেশ আমোদ আহ্লাদের মধ্যে ছিলাম।

সেখানকার রাবি নদীতে আমরা এক একদিন নাইতে যেতাম, এক একদিন-বা নাওয়া দেখতে যেতাম। বৃন্দাবনের গোপীদের মত সেদেশের মেয়েরা সব পাড়ের ওপর কাপড় রেখে জলে নাইতে নামতেন। বোধ হয় আমাদের বসন-চোরার মত কালাচাঁদ সে দেশে ছিল না তাই রক্ষে, নইলে রোজ কাপড় কিনে দিতে দিতে গৃহস্বামীদের হায়রান হতে হ'ত।

সেই সব মেয়েরা ঐ অবস্থায় জলের মধ্যে লাফালাফি মাতামাতি করতেন, পাড়ের ওপর দিয়ে কত লোক যাতায়াত করছে, সেদিকে দিগঙ্গনাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না; যেন কুকুর বিড়াল বানর চলে যাচ্ছে এমনই তাঁদের ভাব। এই ব্যাপার দেখে আমারা যত হাসি, তাঁরাও তত হাসেন।

তা ছাড়া আমরা প্রায়ই গোলাপ বাগে বেড়াতে যেতাম, জানিনা এর মত সুন্দর বাগান পৃথিবীতে আর ক'টি আছে। সে বাগানের দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলব না। তিন তলা বাগান, বেশ থাক-করা; তবে তার ভাগ নীচে থেকে ওপর নয় ওপর থেকে নীচে। ঝরণার জল তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে একতলায় অবিশ্রান্ত পড়ে বয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটী খুব বড় চৌবাচ্চা আছে, তাকে ছোট-খাট পুকুর বললেও চলে, চারদিকে তার শ্বেত পাথরের গাঁথনি, সেটি প্রায় বিশ হাত লম্বা পনর হাত চওড়া, গভীরও মন্দ নয়,—অর্দ্ধেন্দুবাবুর মত লম্বা মানুষের একগলা-ভোর জল সব সময় থাকে। তার চারদিকে পর পর প্রায় হাজার কুলুঙ্গি, বেগমরা নাকি যখন সেই চৌবাচ্চায় নাইতে আসতেন তখন এই সব কুলুঙ্গিতে এক একটি করে প্রদীপ জেলে দেওয়া হ'ত। তারই ঠিক সামনে একটি শ্বেত-পাথরের বেদি, সেই বেদির ওপর বসে বাদশা তাঁদের স্নান দেখতেন, বেদির চার পাশে নালি কাটা আছে; জল বেশী হ'লে সেই নালি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাগানে পড়ত। দেখতে দেখতে আমার মনে হত ঝরণার এই জলবিন্দু যখন সুধামুখী সুন্দরী নবযৌবনোদ্ভাষিতা রমণীদের মুখে

মাথায় পড়ত, তখন তাঁদের মুখের কি শোভাই না হ'ত! আর বাদশা সেই বেদির ওপর বসে সোনার গুড়গুড়িতে মুক্তার ঝালোর দেওয়া সরপোষে ঢাকা অম্বুরি তামাক টানতে টানতে রূপসী বেগমদের রূপের নেশায় বিভোর হ'য়ে তাঁদের সেই জলকেলি দেখতেন।

তারপর ফুলের কথা আর কি বলব, চারদিকে কত রকমের যে ফুল! তার মধ্যে গোলাপেরই বাহার বেশী। যে দিকে তাকাই সে দিকে কেবল গোলাপ—শত শত সহস্র সহস্র গোলাপ। আমার যে কি আনন্দ হ'ত তা আমি বল্‌তে পারিনি। ছেলেবেলা থেকেই ফুল আমি বড় ভালবাসতাম, এ বৃদ্ধ বয়সেও আমি ফুল ঠিক তেমনই ভালবাসি। গোলাপই আমার বেশী প্রিয়। আমি বাগান থেকে কোঁচড় ভরে ফুল তুলে আনতাম, এবং কত যত্ন করে সেগুলি সাজিয়ে রাখতাম, ফুল পেলে আমি কাজ-কর্ম্ম সব ভুলে যাই। কেউ ফুল ছিঁড়লে আমার ভারী কষ্ট হয়, মনে হয় ফুলের কত লাগে!

গোলাপ বাগ যাঁর জেম্মায় ছিল, তাঁর সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুবাবু খুব আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। কাজেই সে বাগানে আমাদের অবারিত গতি ছিল। আমার যখন ইচ্ছে হত সেখানে যেতাম, যত ইচ্ছে ফুল তুলে আনতাম, বারণ করবার ত কেউ ছিল না। একদিন আমরা ক'জন মিলে সেই চৌবাচ্চায় না পড়ে, মাতামাতি জুড়ে দিলাম। ধর্ম্মদাসবাবু বাদশার জন্যে তৈরী সেই বেদির ওপর বসে বকাবকি আরম্ভ করলেন। ভয়ে ভয়ে ত সবাই উঠে পড়ল, আমি কিন্তু উঠলুম না। আমি চিরদিনই আহ্লাদে-গোপাল কিনা। নীলমাধববাবুও সেখানে ছিলেন, তিনি না এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে টেনে তুলে আমার সেই ভিজে কাপড় নিঙড়ে আমার গা মুছিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর দু'খানা শুকনো চাদর আমায় দিলেন, একখানা দু' পাট করে পরলুম, আর একখানা গায়ে দিলুম। এমনই ভাবে ত সে দিন বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম।

আমরা যে বাড়ীখানায় ছিলুম, সেটা পাঁচ তলা। তবে বাইরে থেকে দেখলে মনে হ'ত দোতলা; কেন না তার তিনটে তলা মাটির নীচে। সেখানকার লোকের মুখে শুনলুম, এখানে বড় গরম বলে এই রকম ব্যবস্থা। তা ছাড়া মুসলমানদের যখন রাজত্ব ছিল, তখন মেয়েদের ওপর পাছে অত্যাচার হয় এই ভয়ে তাদের লুকিয়ে রাখবার জন্যে এই রকম মাটির নীচে ঘর করা হ'ত। বাড়ীটায় সাপের বড় ভয় ছিল। অনেকে নাকি সাপ দেখেওচে—সাত আট হাত লম্বা সাপ নাকি! আমি কিন্তু কোনদিন দেখিনি। মেয়েদের ওপরে ওঠবার

জন্যে ভেতর দিকে আলাদা সিঁড়ি ছিল, একটা সরু লম্বা গলি দিয়ে ভেতর মহলে যেতে হ'ত। নীলমাধববাবু সেখানে দাঁড়িয়ে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতেন, সাপেরাও নাকি আস্তে আস্তে সরে যেত, তারপর মেয়েরা ভেতরে ঢুকত। আমি কিন্তু ভয়ে সে সিঁড়ির দিকে যেতাম না—আমি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতাম। এ সিঁড়ি দিয়ে অবশ্য মেয়েদের ওঠা বারণ ছিল, সে কথা কে শোনে? আমার যে সাত খুন মাপ! তবে এই সাপ দেখার কথা সত্যি কি না, সে বিষয়ে আমার এখনও কেমন সন্দেহ আছে, হয় ত

"হাটে গেছল বাঘের মা
দেখে এসেছিল বাঘের ছা,
তুমি বল্লে আমি শুনলুম;
হে দেখ্‌ মা, বাঘ দেখলুম।"

যাক্, ক্রমে আমাদের বিদায় নেবার সময় এল। শেষ অভিনয়ের দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি গান বেঁধে দেন, তার একটি লাইন আমার মনে আছে; গানটি এই,—

"লাহোরবাসী, লইতে বিদায়
দুঃখে প্রাণে আমাদের সকলের—"

গানটি গাওয়া হ'ল,

"নিদয় বিধাতা, কেনরে আমারে,
ভারতে পাঠালে রমণী করিয়া—"

এই সুরে। অভিনয়ের পর একটি সভা হয়, আমরা সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জলের মধ্যে লাহোরবাসীদের কাছে বিদায় নিই।

আমাকে নিয়ে এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ সিং বলে একজন মস্ত বড় লোক সেখানে ছিলেন, তাঁকে সবাই রাজা বলে ডাকৃত। তাঁর খেয়াল হ'ল আমায় তিনি বিয়ে করে জাতে তুলে নেবেন। মাকে তিনি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেশে পাঠাতে চাইলেন, আর এ কথাও বল্লেন, মা যদি সেখানে থাকতে চান, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই; মাসে তিনি ৫০০৲ করে দেবেন। মা ত কেঁদেই অস্থির, তাঁর ভয় হ'ল যদি তিনি আমায় কেড়ে নেন। ধর্ম্মদাসবাবু তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেন, "না গো ওঁরা ভদ্রলোক, ওরা অসদ্ব্যবহার করবে না। আর আমরাও শিগ্‌গির চলে যাচ্ছি, ভয় কি!" আমি সিংজিকে দেখেছিলুম, খুব সুন্দর, কিন্তু যে তার লম্বা দাড়ি! দেখেই

ভয় হ'ত, আমি ছোটবেলা দাড়িওলা লোক মোটেই দেখতে পারতুম না। হ্যাঁ একটা কথা বলা হয়নি,—'সতী কি কলঙ্কিনী'তে আমি রাধিকা সেজেছিলাম, সেই সাজে আমায় দেখে তাঁর বিয়ে করতে খেয়াল হ'য়েছিল। শেষটা গল্পের মতই হ'ল, আমাদের বিয়ে আর হ'ল না।

এ ত সামান্য টাকা,—আমার এই অভিনেত্রী-জীবনে দু'তিনবার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে এসেছিল, থিয়েটারের মায়ায় তা আমি ধূলোর মত দূরে নিক্ষেপ করেছিলাম। এখন সত্যি তার জন্যে অনুতাপ হয়,—যাক্ গতস্য শোচনা নাস্তি!

লাহোর থেকে আমরা মিরাট যাই; সেখানে মাত্র তিন দিন অভিনয় হয়েছিল। তারপর আমরা লক্ষ্ণৌ গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে একটা খুব হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সে কথা এর পরে বলব।

মিরাট থেকে লক্ষ্ণৌ যাবার মাঝখানে আমরা দিনকতক আগ্রায় "প্লে" করি, আগ্রায় আমরা বেশিদিন ছিলুম না। বোধ হয় সেখানে টিকিট বিক্রয় বড় বেশী হ'ত না। মাত্র তিন চার দিন আমরা আগ্রায় ছিলাম। রাত্রে অভিনয় হ'ত, আর দিনের বেলায় আমাদের কাজ ছিল, যমুনার ধার, আর বড় বড় সব বাড়ী দেখে বেড়ান। ধর্ম্মদাসবাবু এবং অবিনাশবাবু আমাদের এই সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁদের উপর নির্ভর করে আমরা যেমন বিদেশে গেছিলাম, তাঁরাও তেমনি যত্ন ক'রে আমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে বেড়াতেন; তাঁদের ব্যবহারে কোন দোষ ধরবার ছিল না। আগ্রায় অভিনয় করবার সময়ই কথা উঠলো, বৃন্দাবনের এত কাছে এসে, গোবিন্দজী না দেখে দেশে ফেরাটা নিতান্তই অ-হিন্দুর মত হয়, কাজেই দলের সকলেরই মত হ'ল, লক্ষ্ণৌ যাবার আগে একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে যাওয়াই উচিত, যেমনি কথা উঠলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। তখন আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাবার রেল হয়নি। আমাদের সব উটের গাড়ীতেই যেতে হ'ল। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে গাড়ীতে উঠলেম। উটের গাড়ীখানা দোতলা ছিল, আমি ত আগেই দোতলার ওপর উঠে বসলাম; লক্ষ্মী নারায়ণী আমার সঙ্গেই ওপরে এসে বসল। মা, ক্ষেত্রদিদি এরা নীচেই বসলো,—কাদম্বিনীও তাদের সঙ্গে বসলো। তিনি আমাদের সঙ্গে বড় মিশতেন না, তিনি একটু গম্ভীর হয়েই থাকতেন, একে গায়িকা, তাতে আবার তখনকার বড় অভিনেত্রী—যাক, তারপর সমস্ত দিন রাত হটর হটর ক'রে উটের

গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে পরদিন সকাল সাতটায় বৃন্দাবনে পৌঁছান গেল। যাবার সময় পথে সকলের কি আনন্দ, দেবদর্শনের জন্য সকলের কি উৎসাহ! থিয়েটার করতে এসে জীবনের একটা মস্ত সাধ পূর্ণ হবার সুযোগ গোবিন্‌জী করে দিয়েছেন। তখনকার দিনে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি ছিল। আমার মা ও ক্ষেতুদিদির আনন্দ যেন সকলের চেয়ে বেশী। যমুনার ধারে একটা মস্ত আধ্‌ ভাঙ্গা বড় বাড়ী অট্টালিকাবিশেষ বললেও চলে সেখানে গিয়েই আমি উঠলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বোধহয় আগে থেকেই বাড়ীটা আমাদের জন্য ঠিক করে রেখে ছিলেন। তারপর সব ধূলোপায়ে গোবিন্‌জী দেখবার ধূম। অর্দ্ধেন্দুবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু এঁদেরই উদ্যোগ বেশী। সকলের জন্য জলখাবার কিনে বাসায় রেখে সবাই ধূলোপায়ে বেরিয়ে পড়লেন, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে কিন্তু সে সময়ে দেবদর্শনে নিয়ে যেতে কেউ রাজী হলেন না। সবাই বল্লেন, ঘুরে আসতে বেলা পড়ে যাবে, এ দুপুর রোদ্দুরে আমার গিয়ে কাজ নেই, আমি বরং বাসায় বসে সকলের খাবার আগলাই। সন্ধ্যার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি কিন্তু যাবার জন্যে খুব কাঁদা-কাটা করলাম; কিন্তু সে কান্না আমার অরণ্যে রোদনই হ'ল। অর্দ্ধেন্দুবাবু আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রেখে গেলেন। তবে বন্দোবস্ত হ'ল, আমি দরজা বন্ধ ক'রে একলাটি ঘরে বসে থাকবো। কারণ, দরজা খোলা থাকলে বাঁদরে এসে উৎপাত ক'রতে পারে। বৃন্দাবনে বড় বাঁদরের উপদ্রব তখনও এখনও।

আমি কি করি! অগত্যা তাতেই সম্মত হ'লাম। খানিক পরে, একলাটি আর ভাল লাগে না। ক্ষিদেও যে না পেয়েছে তাও নয়, খাবারের ঝুড়ি থেকে কিছু খাবার নিয়ে জানলায় ব'সে খেতে আরম্ভ করলুম। মোটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালা। এক কামড় খেইছি; দেখিনা, একটা বাঁদর এসে জানালার ওপারের ছাদের উপর ব'সে হাত পেতে খাবার চাইছে। কৌতূহল হ'ল তাকে একটু খাব্যর ভেঙ্গে দিলাম। বাস; আর কোথায় আছি; দেখতে দেখতে একে একে, দুইএ দুইএ বানর এসে ছাদে জমতে লাগলো। আমারও উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগলো। আমি তাদের সকলকেই খাবার দিতে আরম্ভ ক'রলাম। খানিক পরে দেখি ও দিককার ছাদে একপাল বাঁদর—আর এদিকে আমার খাবারের চুবড়ী খালি। দু' একটা বাঁদর জানলার গরাদে ধ'রে নাড়া দিতে লাগলো। আমি ভয়ে অস্থির! নিরুপায় হয়ে কেঁদে ফেললাম। বাঁদর কিন্তু আমার কান্নার মর্ম্ম কিছুই বুঝল না; কোন বাঁদরই বোধ হয় বুঝে না।

সেই লাফালাফি, দাপাদাপি আর হাত পেতে খাবার চাওয়া! আমি যত বলি,—"ওরে বাপু, আমার ভাঁড়ারে আর কিছু নেই"—তারা তত লাফায়, আর দাঁত খিঁচোয়। ছাদে বাঁদর আর ঘরের মধ্যে আমি, ঐ বাঁদরদেরই মত একজন, সব খাবার বিলিয়ে দিয়ে কাঁদছি, এমন সময়, আমাদের থিয়েটারের সকলে বাসায় ফিরলেন; আমি তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিলাম। সব খাবার নষ্ট করেছি, ভয়ে আড়ষ্ট। আমার মা, ক্ষেতুদিদি সবাই আমায় বকতে লাগলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু হেসে ব'ল্লেন, "বেশ ক'রেছে, সব ব্রজবাসীদের খাইয়েছে! যেমন ওকে নিয়ে যাওনি, তার উপযুক্ত ফলই ফলেছে।" সন্ধ্যের পর তাঁরা আমায় গোবিন্‌জী দর্শন করাতে নিয়ে গেলেন, দেখে যে আমার মনের অবস্থা কি হ'ল তা লিখে বোঝাবার নয়।

তার পরদিন 'নিধুবন' দেখতে যাওয়া হ'ল। যাবার সময় পাণ্ডারা বলে দিলেন, খুব সাবধান, দেখবেন কেউ কোন খাবার সঙ্গে নেবেন না, তা হ'লে ভারি মুস্কিলে পড়বেন, বাঁদররা ভারি উৎপাত করবে। আমরা এমনই আনন্দে বিভোর হ'য়েছিলাম যে, পাণ্ডার কথা কানেও তুললাম না। নিধুবনের কাছে এক জায়গায় ছোলা বিক্রি হচ্ছিল, আমি এর তার কাছ থেকে দু'একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ত ছোলাভাজা কিন্‌লাম, কিনে না নিয়ে কোঁচড়ে পুরে বেশ ক'রে চেপে ধরে সকলের আগে আগে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চললাম। চল্‌তে চল্‌তে যেমনই আমি দল থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছি, অমনই ঠিক আমারই মত অত বড় একটা বাঁদর কোত্থেকে এসে, আমার কাপড় চেপে ধরে বসে রইল। আমি আর কি করি, তাড়াতাড়ি ছোলাভাজা ফেলে দিয়ে ভয়ে চোখ বুজে পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগলাম। তখন দলের সব ছুটে এল, বাঁদরটাও পালিয়ে গেল। পাণ্ডারা বল্লেন আমি যখন ছোলাভাজা কিনি তখনই ঐ বাঁদরটা তা দেখেছিল এবং বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

শ্রীবৃন্দাবনধাম থেকে পরদিনই আমরা সেই উটের গাড়ী চড়ে আগ্রায় ফিরলাম। সেখানে এক রাত্রি বিশ্রাম ক'রে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে রওনা হ'লাম।

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম থেকে পর দিনই আমরা ফিরে এসে একরাত্রি বিশ্রাম করা হ'ল। তারপর আমরা সদলবলে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলাম। আমাদের যাবার আগে সেখানে আমাদের একজন লোককে পাঠান হয়েছিল, সে গিয়ে আমাদের জন্যে একটা বাসা ঠিক করে রেখেছিল। আমরা গিয়ে ত সেখানে

উঠলাম। সেখানে ছত্রমঞ্জিলে ধর্ম্মদাসবাবু সিন খাটিয়ে এক রকম ক'রে ষ্টেজ সাজিয়ে নিলেন, সে বেশ দেখতে হয়েছিল। কলকাতার নামজাদা ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয় করতে এসেছে শুনে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল, থিয়েটার দেখবার জন্যে মারামারি পড়ে গেল। মস্ত বড় এক বাড়ীর মধ্যে আমাদের ষ্টেজ বাঁধা হ'য়েছিল। চারদিকে গ্যাসের আলো জ্বলছিল, সমস্ত বাড়ীটা লোকে ভরে গিয়েছিল, অভিনয়ের সময় বেশ জমজম করতে লাগল।

প্রথম দিন লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তারপর একখানি অপেরা, 'সতী কি কলঙ্কিনী', কি 'কামিনীকুঞ্জ' এমনই একখানি কি অপেরা; এই দু'খানি অপেরাই বেশী হ'ত।

দু'দিন অভিনয় করবার পর একদিন বিশ্রাম করবার জন্য অভিনয় বন্ধ রইল। সে দিন আমরা বেড়াতে বার হ'লাম। কত বাগান, বেগম মহল আমরা দেখে বেড়াতে লাগলাম। তারপর আমরা নবাবের কেল্লা দেখতে গেলাম। মিউটিনির সময় একটা মস্ত বাড়ীর ওপর গোলা এসে পড়েছিল, সেই বাড়ীটা আমরা দেখলাম; তখনও দেওয়ালের গায়ে সেই সব গোলার দাগ রয়েছে, কোথাও বা অনেকটা বালি চুণ খসে গেছে, কোথাও বা খানিকটা জায়গা ভেঙ্গে রয়েছে।

পর দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আসা হ'ল। যত বড় বড় সাহেব মেম ও ওখানকার যত সব বড় লোক, সবই সে দিন থিয়েটার দেখতে আসবেন। তাই স্থির করা হ'ল 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সব চেয়ে সুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জমৃত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!

নীলমাধববাবু কর্ত্তা সাজতেন, নবীনমাধব সাজতেন মহেন্দ্রবাবু, বিন্দুমাধব ভোলানাথ বলে একজন নতুন লোক, উড সাহেব অর্দ্ধেন্দুবাবু, তোরাব মতিলাল সুর, আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশবাবু দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, তার ওপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাটুকাটু মারমার গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের, তাই নীলকুঠির সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাঁকে ভারি সুন্দর মানাত, দেখলেই মনে হ'ত হ্যাঁ সত্যিকারেরই রোগ সাহেব। আর মানাত উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তফি সাহেবকে—আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা। তারপর মতিলাল সুরের তোরাব, সে তোরাব আর হ'ল না। যেমন তাঁকে মানাত, অভিনয়ও করতেন তিনি তেমনই সুন্দর।

বিন্দুমাধবটি ভালমানুষ, কর্ত্তাও নিরীহ গোছের লোক।

ফিমেল পার্টে— ক্ষেতুদিদি সাবিত্রী, কাদম্বিনী সৈরিন্ধ্রী, আমি সরলা, লক্ষ্মী ক্ষেত্রমণি, আর সেই দাসীটি সাজতেন নারায়ণী।

পশ্চিমে আরও ক'জায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের এই ঘেরা বাড়ীতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই।

সেদিন বাড়ী একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লাল মুখ। মুসলমান অনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী খুব কম।

অভিনয় ত আরম্ভ হ'ল। হ্যাঁ ভাল কথা, সে দিনকার প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল ইংরাজীতে, এবং তার সঙ্গে দু'চার কথায় মোটামুটি গল্পটা লিখে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সেদিন যেন কেমন ভয় ভয় করছিল,—কিন্তু অভিনয় যতই এগিয়ে যেতে লাগল, আমাদের সে ভয়ও ক্রমে ভেঙ্গে গেল। আমরা খুব উৎসাহ ক'রে অভিনয় করতে লাগলাম।

ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে, "ও সাহেব তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।" তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, অমনই সাহেব দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জমা হতে লাগল—সে একটা কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল না খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচজনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ ত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল,—আর আমাদের সে কি কাঁপুনি, আর কান্না! ভাবলাম, আর রক্ষে নেই, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেল্‌বে!

যাক, কতক সাহেব চলে গেল, যারা তখনও ক্ষেপে ষ্টেজের ওপর উঠে এল, তাদের আর পাঁচজনে ঠেকাতে লাগল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই কেল্লায় লোক পাঠিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে এলেন,—সে যে কি ব্যাপার তা আর কি বলব। সৈন্য আসতে তখন গোলমাল কতকটা ঠাণ্ডা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনই অভিনয় বন্ধ করে দিলেন এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কোথায় ধর্ম্মদাসবাবু চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। তাঁকে আর খুঁজেই

পাওয়া যায় না! অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল, পেছন দিকে ষ্টেজের নীচে তিনি চুপ করে বসে আছেন। কার্ত্তিক পাল ত তাঁকে ধরে টানাটানি করতে লাগলেন;—তিনি কিছুতেই উঠবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ত্ত ছেড়ে বেরুলেন না, তখন সহকারী ম্যানেজার অবিনাশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলে দিলেন, "এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই, পুলিস সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পৌঁছে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিস পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।"

আমরা ত দুর্গা নাম ক'রতে ক'রতে গাড়ীতে উঠে বাসার দিকে রওনা হলাম। অনেক অভিনেতাও আমাদের গাড়ীর পেছন পেছন এক্কা করে আসতে লাগলেন। সিন্ ড্রেস সব সেই খানেই পড়ে রইল, অবশ্য পুলিসের জিম্মায়। ঠিক হ'ল, সকালে এসে সব জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় এসে পড়লাম। সে ছাই বুকের কাঁপুনি কি আর যায়! খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠে গেল, অনেকেই কিছু খেলে না। সকালে কখন কি ক'রে কলকাতায় ফেরা যাবে তারই পরামর্শ হ'তে লাগল। সে রাতটা আর কারু চোখে ঘুম এল না, ঘুম কি আর আসে!

সকাল বেলা উঠে, ধর্ম্মদাসবাবুও আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে চলে গেলেন। সিন্ ড্রেস দেখে আসবার কথা উঠ্‌ল। ধর্ম্মদাসবাবু বল্লেন, "আমি ওখানে আর যাচ্ছি না, সিন ড্রেস থাক পড়ে।" সেখানে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁরা আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা নিজেরা কুলি পাঠিয়ে সিন্ ড্রেস সব আনিয়ে বেঁধে ছেঁদে লাগেজ ক'রে দিলেন। তাঁদের ভারি ইচ্ছে ছিল আরও দু'এক দিন এখানে অভিনয় হয়, তাঁরা সব ষ্টেশনে এসে সে কথাও বল্‌লেন, "ষ্টেশনের মাঠে ষ্টেজ বেঁধে আপনারা আরও দু'টো দিন অভিনয় করুন।" কিন্তু কেউ আর সেখানে থাকতে রাজি হ'লেন না।

গাড়ী ছাড়বার অনেক আগে, আমরা ষ্টেশনে গিয়ে বসে ছিলাম। তখন ভয়টা আমাদের কমে এসেছিল; আর কি, ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছি, এইবার গাড়ীতে উঠ্‌তে পারলেই ত কল্‌কাতায় পৌঁছে যাব। মনে সখেরও উদয় হ'ল, লক্ষ্ণৌ এলাম এখানকার কোন জিনিষ পত্তর ত নেওয়া হ'ল না। নীলমাধব বাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি তাই শুনে আমার জন্যে কতকগুলো

কাঠের খেলনা আর একখানি ফুলকাটা চাদর কিনিয়ে আনালেন। জিনিষগুলো পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হ'ল তা আর কি বল্‌ব। ভয়টয় সব কোথায় দূর হ'য়ে গেল। আমি খেলনাগুলো নিয়ে খেলতে বসে গেলাম! আমি ভারি চঞ্চল ছিলাম, তাই অনেকেই আমায় দেখতে পারত না। কনসার্টের লোকেদের ত আমি দু'চোখের বিষ ছিলাম। মাঝে মাঝে তাদের ঘর থেকে এটা ওটা নিয়ে আমি পালিয়ে আস্‌তাম কি না। তবে অর্দ্ধেন্দুবাবুও আমায় স্নেহ করতেন, আমায় মিষ্টি কথা বলতেন।

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। নীলমাধববাবুর সেই কবেকার সেই স্নেহের দান লক্ষ্ণৌয়ের সেই ফুলকাটা চাদরখানি এখনও আমার কাছে আছে, আমি সেখানি যত্ন করে তুলে রেখেছি।

যাক, দু'রাত ট্রেনে কাটিয়ে আমরা কল্‌কাতায় এসে পৌঁছে শেষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তিন মাস কলকাতায় ছিলাম না, সব যেন কেমন নতুন নতুন মনে হ'তে লাগল।

এমনি ক'রে তিন চার মাস পশ্চিমে ঘুরে আমরা আবার দেশে ফিরে এলাম। আমার যতদূর মনে হয়, ন্যাশনাল থিয়েটারের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন থিয়েটার কোম্পানী এতদিন ধ'রে বিদেশে কাটাননি। প্রথম আমলে আমাদের মত ঘরবাসী বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে অতদিন ধ'রে বিদেশে ঘুরে বেড়ান একটা কম কথা নয়। এখনকার অভিনেত্রীদের বল্‌লে সহজে বড় কেউ অতদিন বিদেশে বেড়াতে রাজি হন কিনা সন্দেহ। নতুন জিনিষের আদর কদর চিরদিনই বেশী; থিয়েটারটা তখন আমাদের কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ; এই থিয়েটার যাতে ভাল চলে, দেশ বিদেশের লোককে এই থিয়েটার দেখাতে হবে, এই রকম একটা উৎসাহ এই বিদেশ বেড়ানর মূলে ছিল নিশ্চয়ই। নতুবা শুধু পয়সার খাতিরে সহজে কি আর বেদেদের মত টোল্ ফেলে কেউ প্রবাসে ঘুরে বেড়াতে যায়? আর তখন থিয়েটারে পয়সাই বা কি ছিল; এখনকার হিসাবে তখনকার মাহিনা এত কম যে, সে কথা না তুলাই ভাল। তখন দলের অধিকাংশই থিয়েটার ক'রতেন সখের খাতিরে, দেশে একটা নতুন জিনিষের প্রচারের জন্য; সম্পূর্ণ পেটের জন্য নয়। আর আমার মনে হয় গোড়ায় এমনি ক'রে তাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন বলেই আজ বাঙ্গালা থিয়েটারের এই আর্থিক উন্নতি হয়েছে।

কলকাতায় ফিরে এসে আমি মাস খানেক, কি দু' মাস ন্যাশনাল থিয়েটারে কাজ করেছিলাম, তারপর কি কারণে ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ন্যাশনাল থিয়েটার উঠে যাওয়ার জন্যই আমি বেঙ্গল থিয়েটারে ভর্ত্তি হই। পূর্ব্বেই বলেছি বেঙ্গল থিয়েটারের তখন মালিক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সাতুবাবুর দৌহিত্র ৺ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এবং ৺ চারুচন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল থিয়েটারে আগে খোলার চাল ছিল, এবারে গিয়ে দেখলুম, খোলার বদলে করগেট হ'য়েছে, বাইরেরও অনেক অদল বদল হয়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়। প্লাটফরম সেই মাটির ঢিপিই ছিল। প্লাট-ফরমের আগাগোড়া মাটি—মাঝে খানিকটা তক্তা বসান, নীচে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ষ্টেজের ভেতর হতে বরাবর অডিটোরিয়ামে যাওয়া যেত। যারা কনসার্ট বাজাত তারা ঐ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। মাটির প্লাটফরমের কারণ এই—বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজে অনেক নাটকে ঘোড়া বার করা হ'ত। শরৎবাবুর ঘোড়ার সখ ছিল খুব ; তিনি খুব ভাল সওয়ার ছিলেন, তখন শুনতাম, তাঁর মত ঘোড়ার সওয়ার বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিল না। শরৎবাবু তাঁর এই ঘোড়া চড়া নিয়ে অনেক গল্প বলতেন ; আমরাও দেখেছি, ষ্টেজে ঘোড়া বেরিয়ে দুষ্টুমি করছে, কিন্তু যেই শরৎবাবু ঘোড়ার গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে শান্ত শিষ্ট, যেন কিছুই জানে না। শরৎবাবুর একটা সখের টাট্টু ঘোড়া ছিল। তিনি সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে, তাঁদের বাড়ীতে, একতলা থেকে, সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলায়, ঠাকুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর তাঁর ঠাকুরমা, ঠাকুরের প্রসাদী ফল-মূল ঘোড়াকে খেতে দিতেন।

আমি যখন বেঙ্গল থিয়েটারে যাই, তখন সেখানকার অভিনেতা ছিলেন স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরি বৈষ্ণব, গিরিশ ঘোষ (ল্যাদাড়ু), মথুরবাবু (এখনও জীবিত), শরৎবাবু নিজেও অভিনয় করতেন ; শরৎবাবুর এক ভাগিনেয় উমিচাঁদবাবু প্রভৃতি, আর সব নাম মনে নেই। অভিনেত্রী ছিলেন গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলাকেশী, ভুনী, তারপর আমি গিয়ে যোগ দিই। বেঙ্গল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন অনেক। ডিরেক্টারদের মধ্যে ছিলেন কুমার বাহাদুর, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী, ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, হালদার মহাশয় ব'লে একজন ব্যারিষ্টার কি উকিল, ভূষণবাবু ইহারা প্রায় রোজই আসতেন, আর সকল পরামর্শের মধ্যে থাকতেন। ইহাদের মধ্যে কাহারা বাঁচিয়া আছেন, জানিনা। আর কারও সঙ্গে দেখাও হয় না। আরো সব গণ্য মান্য শিক্ষিত কত ভদ্রলোকই যে আসতেন, তাঁদেরই বা কি উৎসাহ! তখনকার,

থিয়েটার একটা সাহিত্য আলোচনার স্থান ছিল। কত রকমের কথা, কত প্রসঙ্গ যে চলত, তখন কিই-বা বুঝি! তবে দেখতাম যে, থিয়েটার একটা বিশিষ্ট ভদ্র সম্প্রদায়ের বৈঠক ছিল।

পূর্ব্বে যে উমিচাঁদ বাবুর কথা বলেছি, তাঁর মৃত্যুর কথা মনে হ'লে এখনও প্রাণ কেঁদে ওঠে! ওঃ—সে কি—হৃদয় বিদারী দৃশ্য!

আমাদের কোম্পানী কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে অভিনয় করবার জন্য আহুত হয়েছে। আমরা সব দল বেঁধে, যে যার মোট ঘাট নিয়ে শিয়ালদহে গাড়িতে গিয়ে উঠেছি। রিজার্ভ করা গাড়ী। আমরা দলে চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন হব, সব এক গাড়ীতেই আছি। কলকাতা থেকে ছেড়ে, গাড়ী কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে দাঁড়াল, ছোট বাবু (স্বর্গীয় চারুবাবু) বল্লেন, "উমিচাঁদ জলখাবার নেওয়া হয়নি, বড় ষ্টেশন, দেখত যদি কিছু খাবার পাও।" উমিচাঁদবাবু খাবার আনতে গাড়ী থেকে নামলেন। খানিক পরে খাবার নিয়ে ফিরেও এলেন, কিন্তু কি একটা ভুল হওয়ায় আবার তিনি দোকানে ছুটলেন। দৈব-দুর্ব্বিপাক। তাঁর ফিরে আসবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, ছোটবাবু "উমিচাঁদ উমিচাঁদ" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় বা উমিচাঁদ—গাড়ী ছেড়ে দিলে। ছোটবাবু গাড়ীর দরজা খুলে, গলা বাড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, "উমিচাঁদ উমিচাঁদ।" উমিচাঁদবাবুকেও দেখা গেল! তিনিও ছুটতে ছুটতে এসে চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়লেন, ছোটবাবু এক রকম তাঁর হাত ধ'রে টেনে তুললেন। কিন্তু তুল্‌লে কি হবে? গাড়ীতে উঠেই উমিচাঁদবাবু একখানা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে কথা নেই, সর্দ্দি-গরমী হয়েছে, গাড়ী কিন্তু তখন ছুটে চলেছে। জল, জল—চারিদিকে রব উঠলো—জল—জল! কিন্তু কি গ্রহের ফের, আমরা চল্লিশ পঞ্চা জন লোক আছি বটে, কিন্তু আমাদের কারও কাছে এক ফোঁটাও জল নেই। গাড়ীর মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। কি হবে! মৃত্যু পথের যাত্রী—কিন্তু তাঁর পিপাসার্ত্ত কণ্ঠে দেবার জন্য এক ফোঁটাও জল নেই! হায়, হায়, ভেবে দেখুন, তখন আমাদের কি অবস্থা! আমাদের মধ্যে অভিনেত্রী ভূনীর কোলে তখন একটি ছোট মেয়ে। কোন উপায় না দেখে, ভূনীর স্তন-দুগ্ধ ঝিনুকে ক'রে গেলে, উমিচাঁদবাবুর মৃত্যু-মুখে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তাতে কি হবে? উমিচাঁদবাবু দু'চার ঝিনুক দুধ খেতে না খেতেই সকল মায়া কাটিয়ে পরপারে চ'লে গেলেন, গাড়ীশুদ্ধ সকলে কেঁদে উঠলো! ছোটবাবু বালকের মত কাঁদতে লাগলেন—"উমিচাঁদ, তোর মা'কে কি বলবো, কি ক'রে তাঁকে

মুখ দেখাব? তুই যে তোর মা'র এক সন্তান?" পাছে, সোরগোল শুনে গাড়ী কেটে দিয়ে যায়, এই ভয়ে সকলেই চুপ ক'রে রইল, কারও মুখে একটিও কথা নাই। উমিচাঁদবাবুকে একখানা চাদর চাপা দিয়ে রাখা হ'ল, যেন ঘুমুচ্ছে! ঘুমুচ্ছেই বটে! কিন্তু সে ভাঙ্গবার ঘুম নয়, জাগবার ঘুম নয়!

যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে থামলে, ছোটবাবুরা সকলে লাস জ্বালাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এমনি করে উমিচাঁদকে পথের মাঝে হারিয়ে আমরা কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলাম। অভিনয়ও হ'ল। কিছুই আটকাল না। সংসার নাট্যশালায়ও এমনি ত নিত্য হ'য়ে থাকে। কার জন্য কিছু আটকায় না, যে যাবার সেই যায়। যারা থাকে, তারা তাদের নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা নিয়মিতভাবে অভিনয় ক'রে চলে যায়। উমিচাঁদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। দুদিন বাদে কেউ আর তার কথা বড় মনে ক'রে রাখে না। এই দুনিয়া!

কৃষ্ণনগর থেকে আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন কারু মুখে হাসি ছিল না, সকলেরই মুখে গভীর বিষাদের ছায়া। উমিচাঁদের এই আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

যাক্, এইবার যা বলছিলাম তাই বলি। তখন বেঙ্গল থিয়েটারে মহাকবি মাইকেলের অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ'কে নাটকাকারে পরিণত ক'রে তার অভিনয়ের আয়োজন চলছিল। কি ক'রে 'মেঘনাদ বধ'কে একখানি অভিনয়যোগ্য নাটক করা যায়, সে সম্বন্ধে গিরিশবাবু নাকি সাহায্য করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এই নাটকখানি অভিনয় করতে আমায় বিশেষ মেহনত করতে হয়েছিল। প্রথমে আমরা ত তার ভাব ও ভাষা ঠিক রেখে ভাল ক'রে পড়তেই পারছিলাম না। আমাদের মত অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের পক্ষে ঐ ছন্দ আয়ত্ত করা যে কিরূপ দুরূহ তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারেন। তবে যাঁদের উপর আমাদের শিক্ষার ভার ছিল, তাঁদেরই কৃতিত্বে আমরা অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলাম। তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতি চমৎকার ছিল। তাঁদের কথামত আমরা প্রথমে আমাদের পার্টটি বার কয়েক পড়ে যেতাম। তারপর তাঁরা ভাবটা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। আমরা যখন বেশ বুঝতে পারতাম, তখন সেইখানে বসে বসে মুখে মুখে আমাদের আবৃত্তি করতে দিতেন। তারপর তাঁরা অভিনয় উপযোগী করবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের যে কি পরিশ্রম করতে হ'ত, তা লিখে বোঝাবার নয়। তাঁদের কি

অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল।

আমি পূর্ব্বে একবার বলেছি, স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত দিনের বেলায়। রিহার্সেল শেষ হ'ক আর না হ'ক রাত্রি ১০টার পর আর কোন কাজ হ'ত না। ১০টার পর আর সেখানে কেউ থাকত না।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিণী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম খোলা হয়। দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎ সিংহ সাজতেন শরৎবাবু, ওসমান হরি বৈষ্ণব, কতলু খাঁ বিহারীবাবু, বিমলা গোলাপ, আশমানী এলোকেশী, আয়েষা আমি ও তিলোত্তমা ভূনী। কিন্তু সময় সময় আয়েষা ও তিলোত্তমা দুইই আমায় সাজতে হ'ত, কেন না ভূনির আসার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না, সে সময়ে অসময়ে কামাই করত। আয়েষা ও তিলোত্তমার একটি জায়গা ছাড়া মুখোমুখী আর কোথাও দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। তবে ঐ একটি জায়গার জন্য কোন অসুবিধা হ'ত না, কেননা মূর্চ্ছিতাবস্থায় তিলোত্তমার সঙ্গে আয়েষার দেখা, তিলোত্তমার ত আর কথাবার্ত্তা ছিল না। কিন্তু ঐ দুইটি বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করতে আমার ভারি কষ্ট পেতে হ'ত।

মৃণালিণী নাটকে পশুপতি কিরণবাবু, হেমচন্দ্র হরি বৈষ্ণব, বক্তিয়ার ছোটবাবু, অভিরামস্বামী বিহারীবাবু, দিগ্বিজয় ল্যাদাড়ু গিরিশ, মৃণালিণী ভূনি, মনোরমা আমি, গিরিজায়া গোলাপ। এই মনোরমা অভিনয়ের সমালোচনাকালে তখনকার বড় বড় ইংরেজী খবরের কাগজ আমায় 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ ষ্টেজ' 'সাইনোরা বিনোদিনী' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

কপালকুণ্ডলাও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। নবকুমার সাজতেন হরি বৈষ্ণব, আর কাপালিক সাজতেন বিহারীবাবু। কাপালিক সেজে বিহারী চাটুয্যে মশায় যখন ষ্টেজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে দেখতে কি ভয়ানক হ'ত। আমি তখন কপালকুণ্ডলা সাজতাম, আর মতিবিবি সাজতেন গোলাপ। কাপালিকের সামনে এসে যখন দাঁড়াতাম ভয়ে আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠত।

এ সব কত দিনের পুরাণ কথা! এ সমস্ত স্মৃতি আমার মনে বেশ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। তখনকার অভিনয় কি সুন্দর সহজ স্বাভাবিক হ'ত। অভিনয় যে কি রকম জীবন্ত হ'য়ে উঠত, তা আমি লিখে ঠিক বোঝাতে পারচিনা, পারবও না। সে সব চিত্র আমার মনের ভেতর বুকের ভেতর ছুটোছুটি করছে, লুটোপুটি খাচ্ছে, কিন্তু আমি তাদের বের করে ঠিক ভাবে সবাইয়ের সামনে

ধরতে পারছি না। সে যে . বুঝিয়ে বলবার জিনিষ নয়, অনুভূতির জিনিষ। এখনও আমি প্রায়ই থিয়েটার দেখ্‌তে যাই, সেখানে গিয়ে যেন কি খুঁজি— কিন্তু তা আর খুঁজে পাই না! সময় সময় এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই যে এদের সব অভিনয় অঙ্গভঙ্গীকে ঠেলে ফেলে সেই পূর্ব্ব স্মৃতি মূর্ত্তি ধরে সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, তাঁদের সেই ভাব ভঙ্গী গতিবিধি দপ দপ ক'রে আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে জ্বলে ওঠে।

সে সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের অশ্রুমতী ও সরোজিনী নাটকের অভিনয় হ'য়েছিল। সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখ্‌তেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হ'য়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা ক'রে রাজা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণজিৎ সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাট্‌তে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্‌লেন, "সব মিথ্যে সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর," অমনই সমস্ত দর্শক এত বেশী উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হ'ল ; তাঁদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হ'লেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হ'ল।

.

একটা কথা আমি না বলে থাক্‌তে পাচ্ছিনা। আমরা সেজে গুজে যখন ষ্টেজে নামতাম, তখন আমরা আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে যেতাম। আমাদের নিজেদের সত্তা অবধি ভুলে যেতাম। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও গা শিউরে উঠে!

'সরোজিনী' নাটকের একটী দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্‌

করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই

জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জলুক জলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখ্‌রে যবন দেখ্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবুও কারু ভ্রূক্ষেপ নেই—তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছিনা।

একবার আমি প্রমীলা সেজে চিতারোহণ করতে যাচ্ছি। এমন সময় আমার মাথার রুক্ষ চুল ও চেলির কাপড়ের খানিকটা আঁচলে আগুন ধরে গেছল—আমি তখন এমনই আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েছিলাম যে কিছুই অনুভব করতে পারি নি। আমার চুল জলছে কাপড় জলছে আমার হুঁস নেই। আমি সেই অবস্থায় আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। উপেন্দ্র মিত্র মহাশয় রাবণ সেজেছিলেন, আমার এই বিপদ না দেখে, তিনি ত সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে দু' হাত দিয়ে থাব্‌ড়ে সেই আগুন নিবুতে লাগলেন। তখন যবনিকা সবে অর্দ্ধেক পড়েছে। যাই হ'ক আর পাঁচজন ছুটে এসে কোন রকমে আমাকে ত সে যাত্রা পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। উপেনবাবুর হাত ঝল্‌সে গেছল, আমার দেহের স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়েছিল।

এখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে কি চোখে দেখে তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি না,—তবে তখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের

মধ্যে বিশেষ স্নেহ মমতার বন্ধন ছিল, পরম আত্মীয়ের মত একজন আর একজনকে দেখ্‌ত।

অভিনয় করতে গিয়ে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাঝে মাঝে আরও কত রকম বিপদে পড়তে হয়। আমারও হ'য়েছিল। এখানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করব। একবার গ্রেট্‌ ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্রিটেনিয়া সেজে আমি শূন্য পথে আসছি, এমন সময় হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে আমি ধপ্‌ করে ষ্টেজের মাঝে এসে পড়লাম। গিরিশবাবু মহাশয় ক্লাইভ সেজে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি ঠিক তাঁর সাম্‌নে এসে ত পড়লাম। আমাকে হঠাৎ ধপ্‌ করে পড়তে দেখে তিনি ত চম্‌কে উঠলেন। আমার বাঁ হাতে ছিল ইংলণ্ডের মানচিত্র, আর ডান হাতে ছিল রাজদণ্ড। আমি ত কোন রকমে সেই রাজদণ্ডের সাহায্যে মুখ থুবড়ানর থেকে নিজেকে সাম্‌লে নিলাম, নিয়েই অভিনয় আরম্ভ করে দিলাম—"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি রে বাছনি—" গিরিশবাবু যেন নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলেন। ওদিকে সুধী দর্শকবৃন্দের হাতের তালি হাতেই রয়ে গেল। ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন ষ্টেজ ম্যানেজার, গিরিশবাবু ভেতরে এসে তাঁকে এই মারেন ত এই মারেন।

আর একবার ষ্টার থিয়েটারে নল-দময়ন্তী অভিনয় হচ্ছে। তাতে একটি সরোবরের দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে। মধ্যস্থলের পদ্মটি সবচেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটি কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয় জন কমলবাসিনী বার হয়ে আস্‌তেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হ'ত। প্রত্যহ বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত গিরিশবাবু নিজে দাঁড়িয়ে সখিদের শেখাতেন। এই নৃত্যগীত অভ্যাস করতে গিরিশবাবুর কাছে তাদের যে কত গাল খেতে হ'য়েছিল!

সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখতে ভারি সুন্দর হ'ত। জহর ধর মহাশয় এই সিন্‌টা সাজিয়েছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ্‌ ছিলেন।

আমি দময়ন্তী সেজে সাজঘর থেকে বেরিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দর্শকবৃন্দেরা খুব হাততালি দিয়ে উঠ্‌লেন। শুন্‌লাম একজন সখি না আসায় সব গোলমাল হ'য়ে গেছে—সিন্‌ তুল্‌তে দেরী হচ্ছে, তাই এই ঘন ঘন হাততালি। আর ত দেরী করা চলে না, গিরিশবাবু এসে আমায় ধরলেন, "বিনোদ তোকে বেরুতে হবে।" আমি ত হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সর্ব্বনাশ! সেই কম্পমান পদ্মের ওপর সখীদের দেখলেই যে ভয়ে আমার বুকটা দুড় দুড় করে

উঠ্‌ত। আর আমাকেই কিনা সেই পদ্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমি যে একদিনও অভ্যাস করিনি। এ ত দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তার ওপর আমি দময়ন্তী সেজে মাথার চুল সব ফিটফাট ক'রে এসেছিলাম, ফুলের মুকুট পরে কমলবাসিনী সাজ্‌তে গেলে যে আমার সব চুল খারাপ হ'য়ে যাবে। তখনকার দিনে এত রকমের পরচুলো পাওয়া যেত না। আমায় কখনও পরচুল পরতে হয়নি। আমার নিজের চুলকে আপন ইচ্ছামত তৈরী করে নিতাম। ভগবানের কৃপায় আমার চুলের খুব বাহার ছিল, আমার ঘন চুল এমন নরম ছিল যে যেমনভাবে ইচ্ছে তাকে কুঁচকিয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারতাম। তাই আমায় কখনও ধারকরা চুল পরতে হয়নি। তখনকার দিনে এই কেশ প্রসাধনের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। যাক্ সে কথা, গিরিশবাবু ত আমায় আদর করে মিষ্টি কথা বলে সখি সাজিয়ে ঠেলে ঠুলে ষ্টেজে পাঠিয়ে দিলেন। একটা চলতি কথা আছে না 'খোঁড়ার পা খালে পড়ে'। 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।' আমার ঠিক তাই হ'ল। যেমন ক্রেনে চড়ে ওপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছি, অমনই আমার এলো চুলের রাশি পাক খেয়ে দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেল—আর চড়চড় করে চুল ছিঁড়তে আরম্ভ হ'ল। আমার অর্দ্ধেক মুখ তখন পদ্ম থেকে বেরিয়েছে, নেমেও পড়তে পারি না, ওদিকে চুল ছেঁড়ার সে কি জ্বালা! 'আরে চুল গেল চুল গেল' বলতে বলতে দাশুবাবু না একখানা কাঁচি এনে তিন চার জায়গা কেটে আমার মাথাকে ত ছাড়িয়ে দিলেন।

ভেতরে এসে রাগে আমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলুম। আমি গোঁ ধরে বসলুম আমি আর সাজব না, কিছুতেই সাজব না।

তখন গিরিশবাবু এসে কেমন আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্লেন, "ও এমন কত হয়। তোর খানিকটা চুল নষ্ট হ'য়ে গেছে বলে তুই কাঁদছিস, আর জানিস্ বিলেতের বড় বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকের মাথায় একেবারেই চুল থাকে না, মুখে একটা দাঁতও থাকে না। তুই চুলের জন্যে কাঁদবি কেন? একটা গল্প বলি শোন, গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে পোষাকটা পরে নে।" এই বলে তিনি গল্প আরম্ভ করলেন, "বিলেতের একজন খুব বড় অভিনেত্রী, অভিনয় শেষ করে বাড়ীতে ফিরে এসে প্রথমে পোষাকটি ছেড়ে ফেললেন, তারপর মাথার সেই কোঁকড়ান বাহারে পরচুলের রাশ খুলে রাখলেন, তাঁর দুপাটি দাঁতই বাঁধান ছিল, তা মুখ থেকে টেনে বার করলেন। তাঁর ৫।৬ বছরের

একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে, তারপর তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর নাক ধরে টানাটানি করতে লাগল। তার ধারণা হয়েছিল, তার মা'র নাক-কানও বুঝি জোড়া দেওয়া।" আর কি রাগ থাকে, কোন রকমে হাসি চেপে আমি বল্‌লাম,—"যান মশায় আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না।" এই বলে হাসতে হাসতে আমি ষ্টেজে গিয়ে নামলুম। তিনিও কাজ উদ্ধার ক'রে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন।

গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার জোর জবরদস্তি, মান অভিমান রাগ প্রায়ই চল্‌ত। তিনি আমায় অত্যধিক আদর দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। আমিও তাই বড্ড বেড়ে উঠেছিলুম, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতুম, কিন্তু তার জন্য তিনি আমায় একটি দিনের জন্যও তিরস্কার করেন নি, অনাদর অযত্ন ত করেনই নি। তবে আমিও একটি দিনের জন্য এমন কোন কাজ করিনি, যাতে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হয়।

পরিশিষ্ট : খ*

বা স না

বি নো দি নী দা সী

সাধনা।

নিতুই নূতন ভাবে গাঁথি ফুলহার।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, বনফুল কত সাজে
প্রেমডোর দিয়ে তারে বাঁধি অনিবার
সে মালা কি ভালবাস প্রাণেশ আমার? ॥

স্বাধীন বনের ফুল স্ব-ইচ্ছায় ফোটে
কণামাত্র মধু ল'য়ে, কণ্টকের বোঝা ব'য়ে
সাধ ক'রে ঝরে পড়ে প্রিয় পায় লুটে
তাহাতে কি প্রেমময় তব মন উঠে?

* বাংলা ১৩০৩ সালে বিনোদিনী 'বাসনা' নামে কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করে নিজ জননীকে উৎসর্গ করেছিলেন। তখন বিনোদিনীর বয়স ৩৩ বছর এবং প্রায় দশ বছর থিয়েটারের সঙ্গে সংস্রবশূন্য। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৪ এবং মোট ৪১টি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে মাত্র ১৬টি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, শুধু অভিনেত্রী বলেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিনোদিনীর কবিতাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার কোন যুক্তি নেই। বাংলা সাহিত্যে সেকালের মহিলা কবিদের কাব্যের তুলনায় বিনোদিনীর যে-কোন কবিতাই বোধ হয় নিন্দনীয় নয়। বিনোদিনীর অভিনয়-প্রতিভার অন্তস্তলে একটি সুপ্ত কবি-প্রতিভাও বর্তমান ছিল। তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ এই কবিতাগুলির মধ্যে। বিনোদিনীর মানসিক প্রবণতা ও স্বভাবের চমৎকার প্রতিফলন এতে দেখা যাচ্ছে। এর পরে ১৩১২ সালে বিনোদিনী 'কনক ও নলিনী' নামে একটি ক্ষুদ্র কাহিনীকাব্য রচনা করে নিজ বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। বইটি একটি 'কাব্যোপন্যাস'-নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। উৎসাহী পাঠকেরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে বইটির সন্ধান পাবেন। সম্পাদক।

চাঁদেতে চকোরে খেলে আকাশের গায়
বসিয়ে লতাবিতানে, আনন্দ বিভোর প্রাণে
বনপাখি নাচে গায় প্রেমোদিত কায়
কুল কুল তানে যবে নদী ব'য়ে যায় ॥

স্বপনসঙ্গিনী ল'য়ে, নীরব নিশীথে
কত ভাবে খেলা করি, কতই যতনে ধরি।
বিনা সূতে গেঁথে হার তোমায় বাঁধিতে,
ভাল কি বাস না নাথ! তাতে বাঁধা দিতে?

ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার কোলে বিজলীর হাসি
মধুর মলয়নলে, সোহাগে কুসুম টলে
কোকিলের কুহুতান পথিকের বাঁশী।
ঘুমন্ত শিশুর মুখে সরলতারাশি ॥

এসব সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ বলে ধরাবাসী,
আমার নয়ন মন, তব প্রেমে নিমগন;
অসীম সৌন্দর্য্য হেরে ও মুখের হাসি।
তোমার প্রণয় প্রাণ সদা অভিলাষী ॥

নিকটে বা দূরে থাক তুমিই কামনা,
তুমি হৃদয়ের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি;
প্রেমভাবে সদা তোমা করি আরাধনা।
সিদ্ধ যেন হই নাথ! ইহাই বাসনা ॥

স্মৃতি।

স্মৃতি লো বিষের জ্বালা দিও নাকো আর,
এ সংসারে চিরদিন কিছুই না রয়;
তবে কেন দুঃখ তুমি দাও অনিবার।
তুমি মনে হলে প্রাণে জ্বালা অতিশয় ॥

অস্থায়ী সংসারে কিছু চিরস্থায়ী নয়,
সুখ দুঃখ চিরদিন ঘোরে সমভাবে ;
কালের কবলে সবে হয়ে যাবে লয়।
অনন্ত নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে ॥

কালে নর ভুলে সব কালেতে বিলীন,
চিরদিন নাহি কিছু রহে সুখ আর।
তথাপি সকলে রহে তোমার অধীন ;
সকলি ভুলিতে পারে তোরে ভোলা ভার ॥

যা হবার হইয়াছে পুড়েছে হৃদয়,
কেবল বিষের জ্বালা স্মরণে তোমার।
এখন জীবন মম শ্মশান আলয়।
তবুও তোমার চিন্তা দহে অনিবার ॥

দয়া ক'রে ভুল মোরে শক্তিস্বরূপিনী,
স্মৃতি হ'তে বিস্মৃতিতে অধিক সন্তোষ।
ছাড়িয়ে আশার আশা হ'য়েছি দুঃখিনী ;
আপনা ভুলিলে পরে আরো পরিতোষ ॥

সোহাগ।

আসে সন্ধ্যা দেখি সব নাচে ফুলচয়
হাসে কলি, গায় পাখী
সোনার বরণ মাখি
হেলে দুলে তরতরে বহিছে মলয় ॥

পরশে মলয়ানিল কলিকা সকল
কেহ চমকি চাহিল
(মৃদু) হাসি কেহবা হাসিল
অনিল পরশে কেহ হইল বিকল ॥

মৃদু মৃদু ধীরে ধীরে বহিল পবন
ফুটিল গোলাপকলি
রূপের ঘোমটা খুলি
আদরেতে সমীরণ চুমিল বদন ॥

সোহাগে গোলাপ কয় যাও নাথ যাও
এখন কহিছ কত
প্রেমকথা নানা মত
মল্লিকা পাশেতে গেলে ফিরে নাহি চাও ॥

জানি হে পুরুষজাতি নিঠুর-নিদয়
থাকে যবে যার কাছে
যেন সে তাহার আছে
অদর্শনে কোন কথা প্রাণে নাহি রয়।
যাও যাও প্রাণনাথ আদর এ নয় ॥

পিপাসা।

তৃষিত চাতকী প্রাণ কাতর রহিল,
জীবন শুকাল তবু বারি না মিলিল ;
নবীন নীরদ পানে, চাহিত তৃষিত প্রাণে
এই আশা ছিল মনে বুঝি বারি পাব ;
জানি না জগতে আমি এরূপে শুকাব ॥

শীতল বারির তরে কাতর হইয়া
শত বজ্র ধরিয়াছি হৃদয় পাতিয়া
খেলিত দামিনী-বালা, গগন করিয়ে আলা
এ হৃদয়ে দিত ঢেলে আঁধারের রাশি।
আমারে দেখিয়া হাসিত ঘৃণার হাসি ॥

ঘনঘটা পরিপুর্ণ যে দিকে হেরিত,
কাতর পরাণ মম সেখানে ধাইত,

শুধু বজ্রাঘাত পেতো, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যেতো
ভাঙ্গা হৃদে কতবার জোড়াতাড়া দিয়ে
তথাপি নীরদ পানে থাকিতাম চেয়ে ॥

শুধু আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ রহিল এখন,
কখন না পেলে বিন্দু বারির সিঞ্চন ॥
এখনও রয়েছে মোর, দারুণ আশার ঘোর
নিবেও নিবে না তাহা খালি হাহাকার,
এ রূপ জীবন শেষ হইল আমার ॥

সারাদিন।

সারাদিন সমীরণে খেলিয়া বেড়াই
সন্ধ্যার আলোক জ্বলে, প্রাণের নিভৃত কোলে
নিশ্বাস লুকায়ে রেখে পথ পানে চাই
একটি তারার আলো দেখিবারে পাই ॥

সারাদিন ঘুমঘোরে অবশ হৃদয়
সন্ধ্যার আলোক পেয়ে, একবার দেখে চেয়ে,
মিলন মলিন ভাবে গায় প্রেমগান।
বায়ুর নিশ্বাস সনে মিশে সেই তান ॥

সারাদিন স্বপনের ছায়াপথে বসে
সন্ধ্যার বিষাদ-মাখা, আধ ছায়া আধ ঢাকা
ভাসিয়া ডুবিয়া তাতে ভাবি অবিরাম।
মরমের গ্রন্থি-মাঝে গাঁথা যেই নাম ॥

সারাদিন ছায়াপথে প্রাণ কোথা যায়,
শূন্যে গিয়ে ফিরে ঘুরে, কার অন্বেষণ করে,
কাতর প্রাণের কথা সমীরণে গায়।
সন্ধ্যার আলোক সনে ফিরে যে ধরায় ॥

সারাদিন প্রাণ মোর জাগিয়া ঘুমায়,
কিবা চাই কিবা পাই, এই আছে এই নাই,
ভাবি মনে ঘুমোঘোরে দিন কেটে যাক্।
রবির উত্তাপ তাপে সন্ধ্যা আলো পাক্॥

সারাদিন স্বপ্নে বসে গাঁথি ফুলহার
সাঁঝ হ'লে ফুলহার, চেয়ে দেখি চারিধার।
সন্ধ্যার আলোক মাঝে ভাসে এক তারা।
না ফেলিতে অশ্রুকণা, হয় পথ-হারা॥

অনুতাপ।

১

এখন কি সেইরূপ ভালবাস মোরে।
এখন কি দয়া হয়, এখন মমতাময়,
আছে কি হৃদয় তব এ দাসীর তরে॥

কঠিন পাষাণ আমি ভুলেছি তোমায়।
ভুলেছি তোমার দয়া, ভুলেছি তোমার মায়া
ভুলিয়াছি অকারণ জ্বালাতে জ্বালায়॥

৩

ভুলিয়াছি সেই দিন, যে দিন তোমায়
বিনা দোষে দোষী করে, থাকিতাম রাগ ভরে,
যতনে ধরিয়া কর সাধিতে আমায়॥

৪

আদরে ধরিলে কর যেতাম চলিয়া,
অতিশয় কাতর হয়ে থাকিতে যে পথ চেয়ে
দীর্ঘশ্বাসে যেত কত মরম দহিয়া॥

আবার হেরিলে মোরে সোহাগে তখন,
ভাসিত যুগল আঁখি, হৃদয়ে আনন্দ মাখি,,
কতই যতন করি তুষিতে যে মন ॥

৬

লইয়া গোলাপ ফুল দিতে গেলে করে,
ফুলে যদি ব্যথা পাই, দিব কিনা দিব তাই,
এই কথা বার বার ভাবিতে কাতরে ॥

ক্ষণে ক্ষণে করিতাম কত জ্বালাতন,
নিদারুণ বাক্যবাণে, সতত দহিতে প্রাণে,
তবু অযতন মোর করনি কখন ॥

৮

চাঁদেরে দেখিতে ভালবাসিতাম বলে।
বলিতে সোহাগ ভরে শশী কোথা কহ মোরে
গগনেতে শশী কিবা রয়েছে ভূতলে ॥

৯

কি দেখিছ সুবদনি চাঁদ মুখ তুলে।
ও ত ধনী শশী নয় তব প্রতিবিম্ব হয়
আকাশেতে খেলা করে মম হৃদি ভুলে ॥

১০

তোমার আদরে আমি এত আদরিণী।
শিখায়েছ অভিমান তাই নাহি পূরে প্রাণ
তুমিই করেছ মোরে এত গরবিণী ॥

১১

সকল হৃদয় ঢেলে তুষিতে আমায়।
তোমার আদরে মোরে সংসারে আদর করে,
কেন আঁধারের কোলে ছিলাম কোথায় ॥

১২

প্রাণভরা প্রেম পূরা আদর তোমার।
কেনা জানে অভিমান লুকায়ে বিকায় প্রাণ
এত জেনে অযতন কেবা করে আর ॥

১৩

নারী আবরণ মাত্র উপরে আমার।
ভিতরে পাষাণ দিয়া গড়েছে কঠিন হিয়া
পাষাণ কি গলে কভু দিলে অশ্রুধার ॥

শিখাও আমায়।

আজিকে শশাঙ্ক বড় সেজেছ সুন্দর।
কালিমা হৃদয়ে,
পরাণ গলায়ে,
আনন্দেতে মত্ত হয়ে হয়েছ বিভোর ॥

কাহার হৃদয় শশী করিতে রঞ্জন
লয়ে ফুল হাসি
খেলা কর শশী
মেঘেতে ঢালিয়ে কায় কোথায় গমন ?

লইয়া কলঙ্ক রেখা হাসিছ কেমনে
কলঙ্কিনী নাম
ঘোষে ধরাধাম
দেখ এ হৃদয়শূন্য তম-আবরণে
যুগান্তের জ্বালা শশী সহিছ কেমনে ॥

দেখ হে সুধাংশু নিতি হইলে নির্জ্জন
বসি তরুতলে
নয়ন সলিলে

ধুইয়া করিতে চাই কলঙ্ক বর্জ্জন।
ততই হৃদয় মাঝে দহে হুতাশন ॥

একটি বচন তুমি রাখ আজি মোর।
হৃদয়ে কলঙ্ক
লইয়ে শশাঙ্ক
কেমনে হইয়া থাক সুখেতে বিভোর।
আমারে শিখাও শশী দাসী হব তোর

কেন যে এমন হল।

বিষাদিত প্রাণ মন কিসের কারণ,
কেন এত ভাঙ্গা ভাব হৃদয়-মাঝারে,
নানা ছলে ঘুরে এসে দেয় আবরণ।
মরমে মরমে পিষে প্রাণের সুসারে ॥

যেন কোন দেশান্তরে হারায়েছি প্রাণ,
শূন্য দেহ বহি সদা ঘুরিয়া বেড়াই,
চারিদিকে দেখি সব জনশূন্য স্থান,
সংসারে বাসনা মম কিছু যেন নাই ॥

চিত্রিত সংসার যেন শূন্যভারে দোলে,
চিত্র করা ফল ফুল যেন শব্দহীন,
আঁকা তরু আঁকা পাখী আঁধারের কোলে
সকলই শূন্যে ভরা চেতনাবিহীন ॥

পূর্ণ শশী কাঁদে শুয়ে যামিনীর গায়,
ভেঙ্গে ভেঙ্গে বয়ে যায় মলয়পবন,
দিনমানে প্রেম খেলা পাখি ভুলে যায়।
তমসায় ডোবে সব আশার স্বপন ॥

কি চাই কি·নাহি পাই কিসের কারণ,
সদাই কাতর প্রাণ মম উচাটন,
ছায়া আবরণে যেন কাটাই জীবন,
চির আঁধারের কোলে করিয়া শয়ন ॥

কি কথাটি তার।

কি যেন প্রাণের কথা বলে·গেল কে?
যেন কোন দূর দেশে, কি যেন প্রাণের আশে
কিসের তরে কোথায় যেন গিয়েছিল সে
কি যেন প্রাণের কথা বলে গেল কে?

যেন সে চাঁদের কোলে তারার সনে
খেল্‌তো দিবা নিশি।
যেন সে ফুলের সনে হেলে ছুলে
নাচতো সুখে ভাসি ॥

যেন সে মধুর আলো গায়ে মেখে
চল্‌তো বাতাস ভরে
যেন সে শূন্যে মিশে
যেত ভেসে দেশ দেশান্তরে।

যেন সে প্রাণের ভিতর ধরত কত
সোহাগের ফুল
আপন মনে থাকতো সদা
ঘুমে ঢুলু ঢুল।

জানতো যেন আকাশেতে
বাড়ী ঘর তার।
আর কি কোথায় আছে কিনা
জানতো নাকো আর ॥

যেন সে ভেসে ভেসে দেশে দেশে
ধরতো ফুলের হাসি।
কত সাধ করে আপন গলায়
পরতো প্রেমের ফাঁসি॥

যেন সে চাঁদের চুমোয় বিভোর হয়ে
হতো আপন হারা।
মলয়নিলে কোলে কোরে
ভাবতো পাগল পারা॥

যেন সে ঘুমের ঘোরে চম্‌কে উঠে
চাইতো চারি ধার।
দেখতো কাছে সদা আছে
মুখখানি কার॥

এখন যেন সেখান হতে যাচ্ছে চলে সে
কি যেন প্রাণের কথা বলে গেল কে॥

একটি গোলাপ।

কার তরে ফুটেছ লো গোলাপ সুন্দরী
কে তোরে আদর করে
কে রাখে হৃদয় পরে
কার জন্যে ছড়াতেছ রূপের মাধুরী॥

বল কার আদরেতে তুমি আদরিণী
কে তোমায় ভালবাসে
কার সুখ-সাধ আশে
পরেছ সুন্দর সাজ ওলো সোহাগিনী

কিবা কথা বল্ তোর সমীরণ সনে
দুলে দুলে ঢলে ঢলে
হেসে হেসে গলে গলে
আদরে সোহাগ ভরে আনন্দিত মনে ॥

জাননা কি চিরকাল থাকে না আদর
আজি প্রফুল্লিত মনে
মিশায়ে সোহাগ সনে
যার কথা কহিতেছ আনন্দ অন্তর ॥

দুই দিন পরে তুমি দেখিও আবার
তোমার সে প্রাণধন
আনন্দে বিভোর মন
অন্য ফুলে করে পান মধু অনিবার ॥

এখন আদরে তোরে হৃদয়ে ধরেছে
কালি নাহি রবে ঘোর
ভাঙ্গিবে স্বপন তোর
দেখিবি অন্যের প্রেমে সোহাগে মজেছে

ত্যজি তোর ভালবাসা ভুলেছে সকল
কাঁদিলে না ফিরে চাবে
সাধিলে না কথা কবে
কমল হৃদয়ে সার হবে অশ্রুজল ॥

আর একবার।

একদিন এ জীবনে চাহি দরশন।
ইহাই জানিবে মম শেষ আকিঞ্চন ॥
স্মৃতির বিষম জ্বালা সহি অনিবার।
মধুময় বাক্যে তোষ আর এক বার ॥

ফুলের সুবাস সহ কোথা গেছ ভেসে।
ঘুমঘোরে আছ কোন জোঁছনার দেশে॥
দূর কাননের কোলে পাখী যেন গায়।
সেইরূপ স্মৃতি মম তোমারে জাগায়॥
মম দরশন-আশে বিজন কাননে।
একাকী থাকিতে তুমি আপনার মনে॥
দুই তিন দিন যদি এভাবে যাইত।
তবু অসন্তোষ হৃদে স্থান না পাইত॥
মম আগমন শব্দ শুনিলে শ্রবণে।
বিমল আনন্দ তব ভাতিত নয়নে॥
দূর হতে যেন মম আহ্বানের তরে।
নয়নের জ্যোতিঃ তব আসিত ঠিকরে॥
নীরব বাসনাপূর্ণ হৃদয় তোমার।
এ জীবনে দেখি সাধ আর একবার॥
কত দিন কত নিশি অভিমান ভরে।
থাকিতাম শুধু তোমা কাঁদাবার তরে॥
ক্ষণেকের তরে যদি চাহিতাম হাসি।
ভাসিত আনন্দকণা অশ্রুসনে আসি॥
স্বর্গীয় শোভায় তব নয়ন ভরিত।
মূর্ত্তিমতী ক্ষমা যেন নয়নে উদিত॥
হেরে সে স্নেহের ছায়া বিমল বদনে।
অনুতাপ উপজিত আপনার মনে॥
আর একবার তুমি তেমন করিয়া।
দেখা দাও সেইরূপ মধুর হাসিয়া॥
বহুদিন শুনি নাই সে মধু বচন।
বহু দিন দেখি নাই উজ্জ্বল নয়ন॥
বহু দিন পাই নাই প্রাণের আদর।
বহু দিন হেরি নাই সরল অন্তর॥
বহুদিন হারায়েছি প্রেমের চুম্বন।
বহু দিন ছিঁড়িয়াছে হৃদয় বন্ধন॥

এখন হৃদয় মন পাগল আমার।
আর একবার দেখি এই শেষবার॥

কে বা গায়।

নীরব নিশীথ মাঝে কে ওই গাইছে রে?
গাইছে দুঃখের গান, সমীরণে মিশে তান।
ধীরে ধীরে স্বর-মালা ভাসিয়া যাইছে রে
নীরব নিশীথ মাঝে কে ওই গাইছে রে?

শ্রান্ত ক্লান্ত স্বর ওই গগনে মিশায়,
প্রফুল্লতা নাহি স্বরে, তথাপি যে সুধা ক্ষরে
সুখস্বাদ অবসান নিরাশ আশায়
বসিয়ে বিজন দেশে কেবা ওই গায়॥

বিস্বাদেতে মাখা ওই সঙ্গীত সুন্দর
দিগন্ত ব্যাপিয়া ধায়, যেন সে জানাতে চায়
প্রত্যেক লহরী তার অশ্রুবারিময়
সমীরণে ডাকি যেন দুঃখকথা কয়॥

প্রফুল্লতা কভু যেন ছিল সেই স্বরে
আজি সে উৎসাহ নাই, হৃদয় হয়েছে ছাই;
প্রতিবর্ণ প্রতি ছত্র আবরণ করে
শীতের শিশির মাঝে যেন ডুবে মরে॥

পূর্ণ না হইতে যেন মনের বাসনা
ভেঙ্গেছে হৃদয় তার, আশা বাসা নাহি আর
সংসারে তাহার কিছু নাহিক কামনা
ধীর ভাবে শিখিয়াছে সহিতে যাতনা॥

যেন সে মরম গাঁথা মরমে লুকায়
অতটুকু হৃদে তার, সহে যে দারুণ ভার

আপনার প্রাণে সদা লুকাইতে চায়
তাই সেই মৃদু তানে সুধা ভেসে যায় ॥

আবার চাঁদ।

শশি রে সুন্দর সাজ কে দিয়েছে তোরে।
. াল বাস ভাল বাসি, আনন্দ সাগরে ভাসি
বুক ভরা মুখ ভরা ঐ হাসি হেরে ;
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা কে শিখাল তোরে ॥

চাঁদ রে শুধাই তোরে বল একবার।
এমন মধুর প্রাণ, সুধা ভরা কাণে কাণ
অঙ্কিত করেছ কেন কলঙ্ক রেখায়
এতরূপে হৃদি কালী ঢাকা নাহি যায় ॥

বল শশি ! কি বেদনা প্রাণেতে তোমার
কেন ও হৃদয় মাঝে, কলঙ্কের রেখা সাজে
কি আঘাতে ভেঙ্গেছে ও নির্ম্মল হৃদয়।
(আহা) না জানি হৃদয় তব কত ব্যথা সয় ॥

আমারে বলিতে শশি ! দোষ নাহি কিছু
সমব্যথী হলে পরে, বেদনা জানায় তারে
ব্যথিত হৃদয় তার হয় যে সান্ত্বনা
শশি রে মনের দুঃখ আমায় বল না !

একটি কালীর দাগে এত তব যাতনা
দেখ এ হৃদয় মাঝে, কত শত দাগ সাজে
দেখ কত শিখিয়াছি সহিতে বেদনা।
শশি রে মনের দুঃখ আমায় বল না ॥

ওরে আমার খুকি মাণিক।

নেচে নেচে খেলা কর ওরে যাদুধন
নেচে নেচে তালি দিয়ে, এস যাদু মা বলিয়ে,
জুড়াক আমার প্রাণ হেরিয়ে বদন।
ওরে মোর খুকুরানী অমূল্য রতন ॥

কত সুধা ঝরে রানী ও কোচি অধরে
তালি দিয়ে নেচে চল, কোটি চাঁদ ঝলমল,
কনক কিরণ কণা পড়ে ঝরে ঝরে।
অনিমিষে হেরি তবু প্রাণ নাহি ভরে ॥

কি দিয়ে গড়েছে বিধি কিসে প্রাণ ভরা
চাঁদের ঘুমান হাসি, তোমার অধরে আসি,
ফুলের কমল কায় আবরণ করা।
মধুর মাধুরীময় প্রাণমন হরা ॥

বল দেখি এত সুধা কোথা তুমি পাও
ক্ষুদ্র ও হৃদয়খানি, সুধা রসে পূর্ণ জানি,
দুঃখিনী মায়েরে কত যতনে বিলাও।
আমি কেন যেবা চায় তারে তুমি দাও ॥

ননীর পুত্তলি মম ওরে খুকুরানী
কত জন্ম পুণ্য ফলে, ও চাঁদ পেয়েছি কোলে,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ হেরি মুখখানি।
আমার দুধের মেয়ে ওরে পুঁটু রানী ॥

কত কথা কও রানী আধ আধ স্বরে
মা মা বলি ছুটি ছুটি, এস রানী গুটি গুটি,
কতই সুন্দর হাসি খেলে ও অধরে।
কোটি কোটি শশী যেন একত্র বিহরে ॥

কত জ্বালা ভুলি রানী হেরি চাঁদ মুখ
যখন গলাটি ধরে, মা বোলে ডাক আদরে,

মনেতে পড়ে না আর সংসারের দুঃখ।
মরুভূমি মাঝে তুমি স্বরগের সুখ॥

শত কোটি নমি আমি শ্রীহরির পায়
তাঁহার কৃপার বলে, তোমারে পেয়েছি কোলে,
দয়া করে দীর্ঘজীবী করুন তোমায়।
করযোড়ে নমে দাসী, এই ভিক্ষা চায়॥

কোথা গেলি।

আয়রে আয় প্রাণের পাখি
হৃদয় মাঝারে তোরে লুকায়ে রাখি
গহন কানন মাঝে
কোথা তুই হারাইয়া যাবি
হৃদয় বিহঙ্গ তুই মোর
পথ কোথা পাবি॥
চিরদিন বাঁধা ছিলি
হৃদয় পিঞ্জরে;
আজিকে কেন রে পাখি
গেলি তুই উড়ে।
বড় যে যতন কোরে
রেখেছিনু হৃদ্‌পিঞ্জরে
বলনা তুই কেমন কোরে
পলাইয়া গেলি।
মনের মতন সাধের পিঞ্জর
আবার কোথায় পেলি॥
বাঁধা ছিলি প্রেমশিকলে
কেমনে তা ফেল্লি খুলে
ক'ইতিস কত প্রেম কথা

সব কি তুই গেলি ভুলে
অজানা অচেনা দেশে
কেমনে বেড়াবি ॥
মনের মতন সাধের শিকল
আবার কোথায় পাবি ॥
হৃদয় পিঞ্জরে তুই
থাকৃতিস সদা সুখে
বল দেখিরে প্রাণের পাখি
উড়্‌লি কোন দুঃখে ।
সাধ করে দিয়েছিলি ধরা
সাধ করে উড়্‌লি
সাধ করে যে গড়্‌নু খাঁচা
শূন্য করে গেলি ॥

শকুন্তলা ।

রাখ একটি বচন
ক'রো নাকো আঁধার জীবন
না হয় ফিরায়ে দাও
সে প্রেম মিলন ।
নির্জ্জন কানন মাঝে
বসিয়ে বকুল তলে
সোহাগে ধরিয়ে হাত
বলেছিলে প্রাণনাথ
এস প্রিয়ে বাঁধি তোমা
প্রেমের বন্ধনে ।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে
নিঠুর সংসার ভুলে
এস খেলি দুইজনে
সুখের স্বপনে ।

সাক্ষী থাক লতাগণ·
আর মলয় পবন
গোলাপ মালতী ফুল
আর ওই তরুমূল
গগন বিহারী ঐ
বিহঙ্গিনীগণ।
গগনে হাসিছে তারা।
চাঁদে ঢালে সুধা ধারা
দেহ প্রিয়ে অধীনেরে
প্রেমের চুম্বন॥
বিনিময়ে নাও এই
দেহ প্রাণ মন।
সেই ত তটিনী কূল
সেই সব বনফুল
সেই ত গগনে শশী
সেই তরুতলে বসি
বিষাদে মলিন কেন
বিমল বদন।
নয়নে সে জ্যোতি কই!
অধরে সে হাসি কই
আজি অবনত কেন
উজ্জ্বল নয়ন॥

পরিশিষ্ট : গ*

গী ত

বি নো দি নী দা সী

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ধীরে ধীরে কর পার।
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার॥
তরী করে টলমল, পসরাতে উঠে জল,
মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার॥

সিন্ধু—যৎ।

কার প্রেমে অনুরাগে, ভুলেছ এই অধীনীরে।
কি দোষ ক'রেছি হে নাথ, বারেক না চাও ফিরে॥
পুরুষের কঠিন মন, নিত্য নূতনে যতন,
করিলাম হে প্রাণপণ, তবু যতন না করিলে॥
কলঙ্ক গুরু-গঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
ডুমুরের ফুল হ'লে কি (প্রাণ)
রয়েছি হে প্রাণে ম'রে।

---

* অধরচন্দ্র চক্রবর্তী-সংগৃহীত গীত-সংকলন 'রেকর্ড-কাকলী' (২য় সংস্করণ, ১৩২৮) গ্রন্থে বিনোদিনীর রচিত কয়েকটি গীতের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সেকালের গ্রামোফোন্ রেকর্ডে বিনোদিনীর কণ্ঠে স্বরচিত গান অনেকেই শুনেছেন। গ্রামোফোন-রেকর্ডে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের একটি অংশের অভিনয় (সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে)-ও অনেকে শুনেছেন। আজকাল এসব পুরনো রেকর্ডের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। সম্পাদক।

হাম্বির—কাওয়ালী।

তারে ভোলা হ'লো একি দায়!
আমার প্রাণ যায়!
কি ক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়।
বিমল জ্যোছনা মাখা, চন্দ্রমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী, প্রাণ জুড়ায়॥

খাম্বাজ—খেমটা।

চাই না চাই না চাই না রে তোর ওজন করা ভালবাসা
সিন্ধু সম ভালবাসা বিন্দুতে কি যায় পিপাসা॥
ভালবাসা পাকা সোনা, ভালবাসায় খাদ মেশে না
ভালবাসা বেচা কেনা, ভরাডুবি করে আশা॥

ইমন ভূপালী—কাওয়ালী।

(মা) নমস্তে নমস্তে শারদে।
তুমি সুখদা মোক্ষদা, তুমি আদি অন্ত,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি হৃদি-পদ্ম,
কে বুঝিতে পারে গো মা কে বা পাবে অন্ত—
কারে ভাসাও দুঃখনীরে, কারে রাখ শ্রীপদে॥

বেহাগ।

বালিকা-বয়সে ছিলাম স্ববশে কোন জ্বালা সখি জানি না লো।
ছিলাম বালিকা না ছিল যৌবন, নিজ বশে ছিল আপনারি মন,
নব অনুরাগে প্রাণনাথ যবে হাসি হাসি করে ধরিল।
ছিল মরুভূমি এ পাষাণ প্রাণ, ক্ষণেক তাহাতে মোহিল।
তদবধি সদা প্রেম আলাপনে, থাকিতাম সখি আমরা দু'জনে
(সদা) নয়নে নয়নে শয়নে স্বপনে তিলেক তাহারে ছাড়িনি লো-

পরিশিষ্ট : ঘ*

কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়?

(ভূমিকা— শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত)

আমার প্রিয়তমা ছাত্রী—সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর নাম, যাঁহারা আমায় ভালবাসেন, এবং আমার রচিত নাটকাবলী পাঠ করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই সকল মহাত্মাদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত। "কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়," সে কথা সহজে ও সরল ভাষায় বুঝাইতে হইলে, বিনোদিনীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি। তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ ঋণী, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার "চৈতন্যলীলা", "বুদ্ধদেব", "বিল্বমঙ্গল", "নলদময়ন্তী" প্রভৃতি নাটক, যে সর্ব্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার প্রত্যেক নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ও সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন! অভিনয় করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া এমন একটি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, সে সময় অভিনয়—অভিনয় বলিয়া মনে হইত

* অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে ছুটি সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩১৭ থেকে আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৭ পর্যন্ত) বিনোদিনীর আত্মকথার প্রথম সূত্রপাত। 'অভিনেত্রীর আত্মকথা' নামে ষ্টার থিয়েটারের সূত্রপাত (বর্তমান সংস্করণের ৩১ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়। অবশ্য লেখাটি কিঞ্চিৎ বর্জিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহেই বিনোদিনী এ কার্য্যে ব্রতী হন এবং অসম্পূর্ণ এই রচনাকে পূর্ণাঙ্গ করে ২ বছর পরে 'আমার কথা' বইটি প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র 'নাট্যমন্দির' পত্রে বিনোদিনীর আত্মকথার যে একটি ভূমিকা রচনা করেছিলেন এটি সেই ভূমিকা। বিনোদিনীর জীবনী পাঠ করলেই বড় অভিনেত্রী হওয়ার চাবিকাঠি পাওয়া যায়— এত বড় কথা নিজের ছাত্রী সম্পর্কে বলতে গিরিশচন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সম্পাদক।

না, যেন সত্য ঘটনা বলিয়াই অনুভূত হইত। বাস্তবিক সে ছবি এখনও আমার চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে কেমন করিয়া সে অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, কিরূপ সাধনা, কিরূপ প্রাণপণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া সে সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা জানিবার বিষয় হইতে পারে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ যদিও বহুবার যাবৎ কোনও রঙ্গালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সে যে সুনাম—যে সুযশ—যে সুখ্যাতি—যে আদর—যে আপ্যায়ন সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর জিহ্বায় আজ পর্য্যন্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়, সুবিখ্যাত "ভারতবাসী" পত্রিকায় রঙ্গালয় সম্বন্ধে যাহার পত্রাবলী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, বঙ্গ রঙ্গভূমির সে যে একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিল, এবং সে স্তম্ভচ্যুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি অভাগিনী পীড়িতা হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং জগদীশ্বরের কৃপায় কথঞ্চিৎ রোগমুক্ত হইয়া সে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করে, "সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। রুগ্ন, আশাশূন্য, দিনযামিনী এক ভাবেই যাইতেছে; কোনরূপ উৎসাহ নাই, নিরাশার জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্ত্তিত স্রোত চলিতেছে। আপনি আমাকে বার বার বলিয়াছেন, যে ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য্য করে, আবার কার্য্য শেষ হইলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আপনার এই কথাগুলি কতবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমার জীবন দিয়া আমি তো বুঝিতে পরিলাম না, যে আমার দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি কি কার্য্য করিয়াছি, এবং কি কার্য্য করিতেছি? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? কার্য্যের কি অবসান হইল না?" আমি তাহাকে উত্তর দিই, "তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইয়াছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয় স্থলে তোমার অদ্ভুত শক্তির দ্বারা যেরূপ বহু নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার "চৈতন্য লীলায়" চৈতন্য সাজিয়া বহু লোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যে সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে, সে সকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত

উপলব্ধি করা যায় না। যদিচ তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার দোষে নয়— অবস্থায় পড়িয়া ; কিন্তু তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।" পরিশেষে তাহার চঞ্চল চিত্তকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য, আমি তাহাকে তাহার "নাট্য জীবনী" লিখিতে অনুরোধ করি। বিনোদিনী সে কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছে। নিম্নে তাহার স্বরচিত নাট্য জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ সকল মুদ্রিত হইল। অনাবশ্যক বোধে কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়— তাহা আর আমায় নূতন করিয়া লিখিতে হইবে না। বিনোদিনীর "নাট্য জীবন" উক্ত প্রবন্ধের সম্যক উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

[নাট্যমন্দির, ভাদ্র ১৩১৭।]

পরিশিষ্ট : ও*

বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী।

(নাট্যসম্রাট্ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।)

বঙ্গ-রঙ্গভূমির কয়েকজন উজ্জ্বল অভিনেতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, কখনও শোকসভায়, কখনও বা সংবাদপত্রে, কখনও বা রঙ্গমঞ্চ হইতে আমার আন্তরিক শোকপ্রকাশের সহিত তাহাদের কার্য্যদক্ষতা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। যখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর শোকসভা সমাবেশিত হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, তিনিও তাঁহার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সেই শোকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত থাকে। অমৃতবাবু মনে করেন, আমার দ্বারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইলে এবং কোন্ সময়ে কি অবস্থায় তাহারা কার্য্য করিয়াছে, তাহা বিবৃত থাকিলে, এক প্রকার বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে। এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃতবাবুর অনুরোধ। কিন্তু সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহস করি নাই। আমার যাহারা ছাত্র এবং যাহাদের সহিত একত্র কার্য্য করিয়াছি, তাহাদের বিষয়ও লিখিতে গেলে হয়তো একজনের প্রশংসায় অপরের মনে আঘাত লাগিতে পারে, হয়তো বহুদিনের কথা স্মৃতির ভ্রমে, স্বরূপ বর্ণিত হইবে না। তার পর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বর্ত্তমান অবস্থা সমাজের চক্ষে এরূপ উন্নত নয় যে, এক নাট্যামোদী পাঠক ব্যতীত অপর সাধারণের নিকট তাহার মূল্য থাকিবে। আর এক বাধা এই যে, তাহাদের নাট্যজীবনের সহিত আমার নাট্যজীবন এরূপ বিজড়িত যে, অনেক স্থলে আমার আপনার কথাই বলিতে বাধ্য হইব। এ বাধা বড় সাধারণ বাধা নহে। পৃথিবীতে যত প্রকার কঠিন কার্য্য আছে, তন্মধ্যে আপনার কথা আপনি বলিতে যাওয়া কঠিন কার্য্য। অনেক সময়ে প্রকৃত দীনতাও ভাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়; স্বরূপ বর্ণনায় অতি-

* 'আমার কথা'-র দ্বিতীয় (নব) সংস্করণ (১৩২০) থেকে পুনর্মুদ্রিত। সম্পাদক।

রঞ্জিত জ্ঞান হয়; আর সমস্তটাই আত্মম্ভরিতার পরিচয়—এইরূপ পাঠকের মনে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা।' এরূপ হইবার কারণ বিস্তর। অনেক সময় আপনি আপনার দোষ দেখা যায় না এবং আত্মদোষ বর্ণনাও অনেক সময়ে উকীলের বিচারপতির সম্মুখে নিজ মক্কেলের দোষ স্বীকারের ন্যায় ওকালতী ভাবেই হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আন্দোলনে ফল কি? এই সকল চিন্তায় এ পর্য্যন্ত বিরত আছি; কিন্তু অমৃতবাবুও সময়ে সময়ে আসিয়া অনুরোধ করিতে ক্রটি করেন না।

এক্ষণে ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী তাহার নিজ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে দেখাইয়া একটি ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করে। যাঁহারা থিয়েটারে "চৈতন্য লীলা"র নাম শুনিয়াছেন, তিনিই বিনোদিনীর নাম জানেন। "চৈতন্যলীলা" যে কেবলমাত্র নাট্যামোদীরা জানেন, এরূপ নয়; একটি বিশেষ কারণে "চৈতন্যলীলা" অনেক সাধু সন্তের নিকটও পরিচিত। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রঙ্গালয়ের পতিতগণকে তাঁহার মুক্তিপ্রদ পদধূলি প্রদানার্থ "চৈতন্যলীলা" দর্শনচ্ছলে পদার্পণে রঙ্গালয়কে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যলীলায় বিনোদিনী 'চৈতন্যের' ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহুপূর্ব্বে আমি বিনোদিনীকে বলিয়াছিলাম যে, যদি তোমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করো, এবং সেই সকল ঘটনা আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের পথ মার্জ্জিত করিতে পারো, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে। এই কথার উল্লেখ করিয়া এক রকম আমার উপর দাবী রাখিয়া বিনোদিনী তাহার জীবন-আখ্যায়িকার একটি ভূমিকা লিখিতে বলে। আমি নানা কারণে ইতঃস্তত করিয়াছিলাম; আমি বিনোদিনীকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, অবশ্য তুমি ইহা তোমার পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার হৃদয়ব্যথা প্রকাশ করা—তোমার মন্তব্য। কিন্তু তুমি সংসারে ব্যথার ব্যথী কাহাকে পাইলে যে, হৃদয়ব্যথা জানাইতে ব্যাকুল হইয়াছ? আত্মজীবনী লেখা যেরূপ কঠিন আমার ধারণা, তাহাও বুঝাইলাম,—আত্মজীবনী লিখিতে অনেককে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, তাহাও বুঝাইলাম। জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক ডিকেন্স গল্পচ্ছলে আপনার নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। অনেকে বন্ধুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে কেহ বা পুত্রের প্রতি লিপির ছলে আত্মজীবনী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, অতি

উচ্চ ব্যক্তি প্রভৃতিও নিজ জীবনী লিখিতে ব্যঙ্গের ভয় করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনীতে আমি যে ভূমিকা লিখিব, তৎসম্বন্ধে সাধারণকে কি কৈফিয়ৎ দিব? আমিও কৈফিয়তের ভয়ে লিখিতে চাহি না, বিনোদিনীও ছাড়িবে না। কিন্তু সহসা আমার মনে উদয় হইল যে, এই সামান্য বনিতার ক্ষুদ্র জীবনে যে মহান্ শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে! লোকে পরস্পর বলাবলি করে,—এ হীন—ও ঘৃণিত; কিন্তু পতিতপাবন ঘৃণা না করিয়া পতিতকে শ্রীচরণে স্থান দেন। বিনোদিনীর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্ব্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে। এই চরণ-মাহাত্ম্য যাঁহার হৃদয়ে আংশিক স্পর্শ করিয়াছে, তিনিই বিভোল হইয়া ভাবিলেন যে, ভগবান্ অতি হীন অবস্থাগত ব্যক্তিরও সঙ্গে থাকিয়া সুযোগপ্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এরূপ পাপী-তাপী সংসারে কেহই নাই, যাহাকে দয়াময় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনী যদি সমাজকে এ শিক্ষা প্রদান করে, তাহা হইলে বিনোদিনীর জীবন বিফল নয়। এ জীবনী পাঠে ধর্ম্মাভিমানীর দম্ভ খর্ব্ব হইবে, চরিত্রাভিমানী দীনভাব গ্রহণ করিবে এবং পাপী-তাপী আশ্বাসিত হইবে।

যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পন্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুর বাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্বাসিত হইবে যে, যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করি, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জন-সমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিব। যাহারা অভিনেত্রী, তাহারা বুঝিবে— কিরূপ মনোনিবেশের সহিত নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি দোষ হইয়া থাকে, অনেক দোষেই মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতেও মার্জ্জনা পাইব— ভরসা করি।

বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী একস্রোতে লিপিবদ্ধ হইলে, উত্তম হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া অবস্থাভেদে সময়ভেদে লেখা হইয়াছে, তাহা পড়িবামাত্র বোঝা যায়। বিনোদিনী মনের কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়া সহানুভূতি চাহিয়াছে; কিন্তু দেখা যায়, কোথাও কোথাও সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। যে যে ভূমিকা বিনোদিনী অভিনয় করিয়াছিল, প্রতি অভিনয়ই সুন্দর, কিরূপে তাহা অভ্যাস করিয়াছে, তাহাও বর্ণিত আছে,— কিন্তু সে বর্ণনা অনেকটা কবিতা। কিরূপ চেষ্টায় কিরূপ কার্য্য হইয়াছে, কিরূপ কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন, কিরূপ

কণ্ঠস্বর ও হাব-ভাবের প্রতি আধিপত্য আবশ্যক—এ সকল শিক্ষাপযোগীরূপে বর্ণিত না হইয়া আপনার কথাই বলা হইয়াছে। যে অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী লেখার কৌশল, সে কৌশল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমি তাহার প্রধান প্রধান ভূমিকাভিনয়ে, যতদূর স্মরণ আছে, সে চিত্র পাঠককে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিনোদিনী যথার্থ বলিয়াছে যে, তাহার ভূমিকা উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইবার বিশেষ কৌশল ছিল। একটি দৃষ্টান্তে তাহার কতক প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনী গোপার ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিন ভক্ত-চূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু "বুদ্ধদেব" দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দর্শনের পর সহসা সজ্জাগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া, কন্‌সার্টের সময়, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কন্‌সার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইল? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সাজঘরে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপরে একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে 'গোপা' সাজিয়াছিল, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয়কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় দেখিয়া অপর ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজসজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (part) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত ভাবভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যস্ত করা এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ— শ্রম ও চিন্তা-সাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা-ব্যয়ে বিনোদিনী কখন কুণ্ঠিত ছিল না। বিনোদিনীর স্মরণ নাই,

মেঘনাদের সাতটি ভূমিকা বিনোদিনীকে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করিতে হয়, বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হউক, সাতটি ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাতটি ভূমিকা এক জনের দ্বারা অভিনীত হওয়া কঠিন; দুইটি বৈষম্যপূর্ণ ভূমিকা এক নাটকে অভিনয় করা সাধারণ নাট্যশক্তির বিকাশ নয়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা এক ভূমিকায় চরমোৎকর্ষ লাভ করা বিশেষ নাট্যশক্তির কার্য্য। চরমোৎকর্ষ লাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকার কিরূপ অবয়ব হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে, তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্রকরের ন্যায় সেই আভাস আনা প্রয়োজন। অভিনয়কালীন ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী হইবে এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসঙ্গত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে, কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে, সেইক্ষণেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য করিতে পারেন, এরূপ দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন; এবং সে সময়ে অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা— পলাশীর যুদ্ধ দেখিয়া সাধারণীতে সমালোচন,—"ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতারা সকলে সুপাঠক; যিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও জানেন।" এইটুকু এক প্রকার সুখ্যাতি ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।" কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, অতি উচ্চ প্রশংসা দানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সমালোচকশ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্যজগতের চালক ছিলেন। বহু ভূমিকায় বিনোদিনী ঐ সকল সমালোচকের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটি কথা আছে, "বিয়ে কি মা?"— এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপ-বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে "বিয়ে কি মা?" শুনিলে ন্যাকাম মনে হয়। সাজসজ্জায় হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ

হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্ন বালিকা সংসার-জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় মাতাকে "বিয়ে কি মা ?" প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ !
কি হেতু কহিলে—
'ধন্য, ধন্য কলিযুগ' ?
ক্ষুদ্র নর অন্নগত প্রাণ,
রিপুর অধীন সবে ;
রোগশোক সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানব মণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে ;—
কেন কহ বিশ্বনাথ,—ধন্য কলিযুগ ?"

যোগিনীবেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,—ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর ;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতি নিন্দা কেন সব ?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ; অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতি নিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।

"বুদ্ধদেব" নাটকে পতিবিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসনভূষা মম অধিকার !
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে"

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাজ্ঞা একপ্রকার অতুলনীয় হইত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনী বেশ— আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পূর্ব্বাঙ্কে অপ্সরীনিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ-যাজ্ঞার সময় তাপশুষ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনা বোধ হইত। "Light of Asia"-রচয়িতা Edwin Arnold সাহেব এই গোপার অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার Travels in the East নামক গ্রন্থে বঙ্গনাট্যশালা অতি প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রঙ্গালয় দর্শনে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নত, নচেৎ বুদ্ধদেব চরিত্রের ন্যায় দার্শনিক অভিনয় স্থিরভাবে হিন্দু দর্শকমণ্ডলী দেখিতেন না। বিদেশীর চক্ষে এইরূপ হিন্দুর হৃদয়ের অবস্থার পরিচয় দেওয়া রঙ্গালয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। রঙ্গালয়ের পরম বিদ্বেষী ব্যক্তিকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে, সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু "চৈতন্যলীলায়" চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। প্রথমে বাল-গৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম-মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা "অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা"— পুরুষ প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন "কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই ?" বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহ বিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তমভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন; পদধূলিলাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিত-মণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেই জন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—"চৈতন্য হোক।" অনেক পর্ব্বত-গহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই

সাধনাই, অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তত্ হইতে হইলে, অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন— যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থায়ই হোক, এই মহা ছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যান প্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে ফতীর ভূমিকায়, এবং "বিবাহ-বিভ্রাটে" বিলাসিনী কারফর্ম্মার ভূমিকায়, "চোরের উপর বাটপাড়ি"তে গিন্নী, "সধবার একাদশী"তে কাঞ্চন প্রভৃতি হাল্‌কা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্‌সা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত। এক্ষণে যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহাদের ধারণা যে, মতিবিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাঁহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ধারণা যে, কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যাবধি স্নেহপালিত না হওয়ায়, নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকার্য্য করিত, কিন্তু যখন তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী যেরূপ পিঞ্জরমুক্তা হইয়া বনে প্রবেশ মাত্র বন্যবিহঙ্গিনী হইয়া যায়, সেইরূপ গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলা-অংশ-অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল— এই পরিবর্ত্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইত। তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল। এখন হীরার ফুলের অভিনয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে অভিনয় দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতি হীরার ফুল গীতিনাট্যের নায়িকা; কিন্তু যিনি 'হীরার ফুলে' বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ধারণা যে 'হীরার ফুলে' গ্রন্থকার-রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়। অনেক সময়েই আমি বিনোদিনীর সহযোগী অভিনেতা ছিলাম। "মৃণালিনীতে"তে আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ মনোরমা সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি; সমস্ত বলিতে গেলে অনেক কথা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়, কেবল 'মনোরমার' কথাই বলিব। মনোরমার

কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?" বলিয়াই প্রেম-বিহ্বলা বালিকা। হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই "পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া" অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে আসিয় বঙ্কিমবাবু কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিতেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে, এ প্রকৃত 'মৃণালিনী'র মনোরমা। বালিকাভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল, বুঝি বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয় কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন, উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীর সকল ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত—যুবক যুবতী, বালক বালিকা, রাজরাণী হইতে ক্ষতী পর্য্যন্ত সকল ভূমিকার উপযুক্ত। বঙ্গরঙ্গভূমির যদি অন্যরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে বিনোদিনীর অভিনয়-জীবনের আত্মবর্ণনা অনাদৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু এ কথা বলিতে সাহস করা যায়, যদি বঙ্গরঙ্গালয় স্থায়ী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে।

বিনোদিনী আপনার শৈশব-অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। সে সমস্ত আমি অবগত নই। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ চাঁদনীর উপর আমার সহিত তাহার প্রথম দেখা। তখন বিনোদিনী বালিকা। বিনোদিনী সত্য বলিয়াছে, সে সময় তাহাকে নায়িকা সাজাইতে সজ্জাকরকে যাত্রার দলের ছোকরা সাজাইবার প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু সে সময় তাহার শিক্ষাগ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া, ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেত্রী হইবে, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আমিও কিছুদিন থিয়েটার ছাড়িয়াছিলাম, বিনোদিনীও সেই সময় বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নারী অভিনেত্রী লইয়া, ৺মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত "সতী কি কলঙ্কিনী?" অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোন সম্বন্ধ ছিল না। থিয়েটারের নানাদেশ ভ্রমণবৃতান্ত যাহা বিনোদিনী বর্ণনা করিয়াছে, তাহা আমি নিজে কিছু জানি না। পরে যখন ৺কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত একত্র হইয়া থিয়েটার আরম্ভ করি, সেই অবধি

বিনোদিনীর থিয়েটারে অবসর লওয়া পর্য্যন্ত আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনোদিনীর অনেক কথাই অগত আছি। বিনোদিনী হয়তো কেদারবাবু বা অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবে যে, আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাজ্ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্য এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বিনোদিনী আমাদের থিয়েটারে আসার পর এক মাসের বেতন যাহা বেঙ্গল থিয়েটারে বাকী ছিল, তাহা বহুবার তাগাদা করিয়াও বিনোদিনীর মাতা প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার হইতে চলিয়া আসায় তখনকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিনোদিনীর উপর ক্রুদ্ধই হইয়াছিল। ইহার পর আমাদের থিয়েটার একস্রোতে চলে নাই, মাঝে মাঝে হইয়াছে ও আবার বন্ধ হইয়াছে। ৺প্রতাপ চাঁদ জহুরীর থিয়েটারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণের পর হইতে আমি থিয়েটারে প্রথম বেতনভোগী হইয়া যোগদান করি এবং সেই সময় হইতে বিনোদিনী আমার নিকট বিশেষরূপে শিক্ষিতা হয়। বিনোদিনী তাহার জীবনীতে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষের প্রতি তাহার শিক্ষক বলিয়া গাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, আমারও শিক্ষাদানের কথা অতি সম্মানের সহিত আছে ; কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।

উল্লেখ করিয়াছি, সমাজের প্রতি বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষ আছে। বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাহার একটি কন্যাসন্তান হয়, সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কন্যা নীচকুলোদ্ভবা— এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত, কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু তাহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয়-প্রবেশের বাধা প্রদান করিয়াছিল— শুনিতে পাই। এই বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষের কারণ। কিন্তু নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালন না হইলেই ভাল ছিল। যে পাঠক এই জীবনী পাঠ করিবেন, শেষোক্ত লেখনীর কঠোরতায়, প্রারম্ভে যে সহানুভূতি প্রার্থনা আছে, তাহা ভুলিয়া যাইবে।

এই ক্ষুদ্র জীবনীতে অনেক স্থলে রচনাচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্যের পরিচয় আছে। সাধারণের নিকট কিরূপ গৃহীত হইবে— জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিপথে অনেক ঘটনাবলী হর্ষশোকবিজড়িত হইয়া বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় উদয় হইয়াছিল।

উপসংহারে আমার সাধারণের নিকট নিবেদন যে, যিনি বঙ্গরঙ্গালয়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ জানিতে চাহেন, তিনি সে সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে

পারিবেন ও ইচ্ছা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনপ্রবাহ সুখদুঃখে জড়িত হইয়া সাধারণের কৃপাপ্রার্থনায় অতিবাহিত হয় এবং সাধারণের আনন্দের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, এই সর্ত্তে সাধারণকে তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র দুই একটি কথা শুনাইবার দাবি রাখে। যে সহৃদয় ব্যক্তি এ দাবী স্বীকার করিবেন, তিনি এ ক্ষুদ্র কাহিনীপাঠে কৃপাপ্রার্থিনী অভিনেত্রীর নাট্যজীবন বর্ণনার প্রথম উদ্যম কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করিবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পরিশিষ্ট : চ*

বিনোদিনী অভিনীত নাটক ও চরিত্রের তালিকা

নাটকের নাম	চরিত্র
বেণী সংহার	দ্রৌপদীর সখী
হেমলতা	হেমলতা
প্রকৃত বন্ধু	বনবালা
নীলদর্পণ	সরলতা
লীলাবতী	লীলাবতী
সতী কি কলঙ্কিনী	রাধিকা
আদর্শ সতী	(?)
কনক-কানন	(?)
আনন্দ লীলা	(?)
কামিনী কুঞ্জ	(?)
কিঞ্চিৎ জলযোগ	(?)
চোরের উপর বাটপাড়ি	(?)
নবীন তপস্বিনী	কামিনী
সধবার একাদশী	কাঞ্চন

* বিনোদিনীর আত্মকথা এবং অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থ অবলম্বনে এই তালিকা তৈরি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশটির অধিক নাটকে ষাটটির অধিক চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। প্রত্যেক নাটক বহু রজনী অভিনীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই তালিকা অসম্পূর্ণ এবং কালানুক্রমিকভাবে সাজানোও নয়। সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবই তার কারণ। (?)-চিহ্নিত চরিত্রগুলি সম্পর্কে জানতে পারিনি। যে-সব ক্ষেত্রে একই নাটকে একাধিক চরিত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝতে হবে, বিনোদিনী কখনো এক-সঙ্গেই ঐ অভিনয়গুলি একই নাটকে করেছেন— কখনো আবার ঐগুলির কোন একটিতে করেছেন। সম্পাদক।

নাটকের নাম	
বিয়ে পাগলা বুড়ো	(?)
মুস্তফি সাহেব্‌কা পাকা তামাসা	মুস্তফি সাহেবের স্ত্রী
মেঘনাদ বধ	প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, রতি বারুণী, মায়া, সীতা ও মহামায়া
মৃণালিনী	মনোরমা
দুর্গেশনন্দিনী	আয়েষা, তিলোত্তমা আসমানী
সরোজিনী	সরোজিনী
অশ্রুমতী	(?)
দোললীলা	নায়িকা
আগমনী	উমা
মায়াতরু	ফুলহাসি
পলাশীর যুদ্ধ	ব্রিটেনিয়া
মোহিনী প্রতিমা	সাহানা
আলাদিন	বাদসাহ-কন্যা, পরী
আনন্দ রহো	লহনা
রাবণ বধ	সীতা
সীতার বনবাস	লব
অভিমন্যু বধ	উত্তরা
রামের বনবাস	কৈকেয়ী
সীতাহরণ	সীতা
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	দ্রৌপদী
কপাল কুণ্ডলা	কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি
বিষবৃক্ষ	কুন্দনন্দিনী
হামির	লীলা
দক্ষযজ্ঞ	সতী
নল দময়ন্তী	দময়ন্তী

নাটকের নাম	চরিত্র
ধ্রুব চরিত্র	সুরুচি
কমলে কামিনী	খুল্লনা, চণ্ডী
বৃষকেতু	পদ্মাবতী
হীরার ফুল	শশীকলা
শ্রীবৎস-চিন্তা	চিন্তা
চৈতন্যলীলা	চৈতন্য
প্রহ্লাদ চরিত্র	প্রহ্লাদ
নিমাই সন্ন্যাস বা চৈতন্যলীলা (২য় ভাগ)	নিমাই
বুদ্ধদেব চরিত	গোপা
প্রভাস যজ্ঞ	সত্যভামা
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	চিন্তামণি
বেল্লিক বাজার	রঙ্গিনী
বিবাহ বিভ্রাট	বিলাসিনী কারফরমা

পরিশিষ্ট : ছ*

বিনোদিনীর রচনাবলী

১। 'ভারতবাসী' পত্রিকায় রঙ্গালয়বিষয়ক ধারাবাহিক পত্রাবলী। ১২৯২ সাল, ইং ১৮৮৫ খৃঃ।

২। 'সৌরভ' পত্রিকায় বিভিন্ন রচনা। ১৩০২ সাল।

৩। 'বাসনা'। ৪১টি কবিতার সংকলন। পৃষ্ঠা ৮৪। মূল্য ৷৷০। উৎসর্গ নিজ জননীকে। ১৩০৩ সাল।

৪। 'কনক ও নলিনী'। কাহিনীকাব্য বা কাব্যোপন্যাস। ১৩১২ সাল। পৃষ্ঠা ৪৫। মূল্য ।০।

৫। 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'। 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় আত্মকথা রচনার সূত্রপাত। অসম্পূর্ণ (বর্তমান সংস্করণের ৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশের সংক্ষেপিত রূপ)। ১৩১৭ সাল।

৬। 'আমার কথা'। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ, ১৩১৯ সাল। পৃষ্ঠা ৷৷/০+১২৭। মূল্য ৷৷৵০।

৭। 'আমার কথা' বা বিনোদিনীর কথা। নব সংস্করণ, ১৩২০ সাল। পৃষ্ঠা ১৷৶০+১২৪। মূল্য ৷৷৵০।

৮। গীত। অধরচন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত 'রেকর্ড কাকলী' ২য় সংস্করণ, ১৩২৮ সাল এবং 'রেকর্ড সঙ্গীত' ও 'বীণার ঝংকার' নামে অন্য ছুটি গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি গান।

৯। 'আমার অভিনেত্রী জীবন'। 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক স্মৃতিকথা। কোন কোন সংখ্যায় লেখাটির নাম 'অভিনেত্রীর আত্মকথা' ১৩৩১ সালের ৪ঠা মাঘ থেকে (মধ্যে ছুই-একসংখ্যা বাদে) ১৩৩২ সালের ২৬শে বৈশাখ পর্যন্ত মোট ১৬টি সংখ্যায় প্রকাশিত। অসম্পূর্ণ।

* এখন পর্যন্ত যতটা সন্ধান পাওয়া গেছে তার বিবরণ।

ছুটি পত্রিকার সন্ধান চাই :

(ক) 'ভারতবাসী' (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯২ সাল ইং ১৮৮৫ খৃঃ। কলিকাতা পি. এম. সুর কোম্পানীর যত্নে প্রকাশিত। সম্পাদক : হরিদাস গড়গড়ী।

(খ) সৌরভ (মাসিকপত্র) : ১৩০২ সাল (মোট তিন মাস বেরোয়)। শোভাবাজার রাজবাড়ী থেকে গিরিশচন্দ্রের সম্পাদনায় ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহ-সম্পাদনায় প্রকাশিত। সম্পাদক